আরাফাত ময়দানে

– টিটন রহমান

এক সঙ্গে অগণিত ছাতা দেখা যায় বর্ষণমুখর দিনে পথচারীদের মাথায়, স্টেডিয়ামে দর্শক গ্যালারিতে, গ্রামের হাট–বাজারে।

কিন্তু প্রায় দুই মিলিয়ন ছাতা এক সঙ্গে কোথায় ব্যবহৃত হয় জানেন কি? পবিত্র হজব্রত পালনের সময় মক্কার আরাফাত ময়দানে।

হজ করার সময় সেলাই করা পোশাক পরা যায় না। একজন হাজি যখন হজ পালন করতে থাকেন তখন তার গায়ে থাকে সেলাই বিহীন দুই প্রস্থ শাদা কাপড় যার নাম *এহরাম।* একটা লুঙ্গির মতো পেচিয়ে পরা, অন্যটি চাদরের মতো গায়ে জড়ানো থাকে। আর থাকে সেলাই বিহীন টিপ বোতাম দিয়ে বানানো একটা মোটা বেল্ট যার একাধিক পকেট থাকে। এ পকেটেই গচ্ছিত থাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, টাকা–পয়সা, পাসপোর্ট, রেসিডেন্ট পারমিট কার্ড ইত্যাদি।

আর অবশ্যই যা সঙ্গে থাকে তা হলো একটা ছাতা। বাংলাদেশ বিমান প্রতি বছর হজযাত্রীদের একটা করে বিমানের মনোগ্রাম সংবলিত ছাতা দিয়ে থাকে। হজ মরসুমে হজের সময়ে মক্কা নগরীর কমন দৃশ্য সারি সারি তাবু, এহরাম পরা হাজি এবং ছাতা। হজ চলার সময়ে তীব্র রোদ থেকে বাচার অবলম্বন হাজির পোশাক এহরাম এবং ছাতা, তাবু রাত যাপন ও বিশ্রামের স্থান।

প্রতি বছর পবিত্র হজ মরসুমে ছাতার মতো অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটির অস্থায়ী বাণিজ্য আলয় হয়ে পড়ে মক্কা নগরীর রাস্তাঘাট, বিশেষ করে কাবা ঘরের আশপাশের মার্কেট এলাকা। কারণ ছাতা এবং স্যানডাল সহজেই হারাতে পারে। পবিত্র কাবা ঘরে (হেরেম শরিফে) প্রবেশের সময় ছাতা এবং স্যানডাল বাইরে নির্ধারিত স্থানে রাখতে হয়। এক সময় ছাতা আর স্যানডালের স্তূপ জমে যায়। সব ছাতা স্যানডালই প্রায় একই রকম দেখতে হওয়ায় স্তূপ থেকে অনেকে নিজেরটা খুজে পান না অথবা নেন না অন্যেরটা নেয়া হয়ে যেতে পারে ভেবে। অল্প দামে আবারও কিনে নেন। নির্ধারিত ময়লা সরানোর গাড়িকে প্রতিনিয়ত এই ছাতা স্যানডালের স্তূপ পরিষ্কার করতে দেখা যায়।

ওখানে অধিকাংশ ছাতা সুলভ এবং সহজলভ্য। বেশির ভাগ ছাতা দুইপাল্লা কাপড় দিয়ে তৈরি। ওপরের দিকটা শাদা আর ভেতরের দিকটা সবুজ রঙের হয়। সবুজ রঙ তাপ শোষণ কিংবা প্রটেকশনে কোনো ভূমিকা রাখে কি না আমার জানা নেই।

সউদি আরবে চাকরির সুবাদে আমার হজ করার সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৮৬ সালে। রিয়াদের কর্মস্থল থেকে ৩৩জন বাংলাদেশি পেয়েছিলাম হজ পালনের সুযোগ। হজের নিয়মাবলী শিখে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে যখন মক্কা পৌছালাম তখন ছাতার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করলাম। আগের অভিজ্ঞ কয়েকজন সঙ্গে করেই ছাতা নিয়ে গিয়েছিল। বাকিরা মক্কা থেকেই ছাতা কিনেছিলাম।

হজ স্মৃতির স্মারক হিসেবে আমার কাছে রক্ষিত আছে আমার ব্যবহৃত এহরাম, যা মৃত্যুর পর কাফন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটা প্লাস্টিকের বালিশসহ ম্যাট এবং পরবর্তী কালে বহুল ব্যবহারে জীর্ণ মলিন হয়ে যাওয়া একটা ছিয়াশি সালের ছাতা।

হজের স্মৃতি জড়িত ছাতাটা হারাতে চাইনি। তাই নামাজের সময় কাবাঘরে প্রবেশের আগে ছাতাটা তাবুতেই রেখে যেতাম। আরবি জিলহজ মাসের ১০ তারিখে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত

ময়দানে উপস্থিত থাকতে হয়। এটা হজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আরাফাত ময়দানে শেষ হজে বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ওই ভাষণে লিপিবদ্ধ আছে। নবীজি (সাঃ)র ভাষণ দানের স্থানটি চিহ্নিত করে রাখা আছে। একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত স্থানটির নাম *জবলে রহমত*। আমি ১০ জিলহজ তারিখের দিনমান সেই পাহাড়েই অবস্থান করেছিলাম। প্রচণ্ড খরতাপে ছায়ার আশ্রয় পেয়েছিলাম ছাতার তলায়।

এখানেই দৃশ্যমান হয় নানান বর্ণের, নানান দেশের, নানান সংস্কৃতির ধারক–বাহক মিলিয়ন মিলিয়ন হাজির মাথায় ছাতা। ছাতার এমন বিশাল সমাহার পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

সূর্যাস্তের পর আরাফাত ময়দানের পার্শ্ববর্তী মুজদালেফা–য় রাত যাপন এবং শয়তানকে নিক্ষেপের জন্য কঙ্কর (ছোট পাথরের টুকরা) সংগ্রহ করতে হয়। হজের একটা আনুষঙ্গিক কাজ হলো, শয়তানকে ঢিল নিক্ষেপ করা সেই জায়গায় যেখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শয়তান তাড়িত হয়ে শয়তান বিতাড়নের জন্য ঢিল ছুড়েছিলেন। এর বিজ্ঞান ভিত্তিক মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাও আছে। প্রতিটা হাজিকেও ছোট–বড়–মাঝারি তিনটি প্রতীকী স্থানে ঢিল ছুড়তে হয়। নির্দিষ্ট দিনে স্বভাবতই ওইখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়। এই ভিড়ের চাপে মরো মরো অবস্থা হয়েছিল আমার। তবুও ছাতাটা হাতছাড়া করিনি।

হজের সময় তিনবার পথ হারিয়েছি। মিনায় একবার পথ হারিয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটেছি। শরীরের মাংস সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো তেজী রোদ থেকে বাচতে ছাতাটা কি যে সহায়ক হয়েছিল তা বলার নয়। আরবি ভাষা জানতাম না বলে পুলিশের সাহায্য নিতে পারছিলাম না। পথচারী আরো যে হাজারো মানুষ তারা সবাই আমার মতো ভিনদেশি। *মসজিদুল কুয়েত*–এর সন্নিকটে ছিল আমাদের তাবু। এই মসজিদের নাম বলেই এক পুলিশ কর্মচারীর সহায়তায় তাবুতে ফিরি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হজের সময় কর্তব্য পালনরত সউদি পুলিশ হাজিদের সঙ্গে অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করেন। যথাপোযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এবং যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেন। মক্কা ও মদিনার জন্য বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত পুলিশ দল নিয়োজিত হয়।

হজ কমপ্লিট করার পর মদিনা জিয়ারত শেষে কর্মস্থল রিয়াদ ফেরার সময় আমাদের টিমলিডার হোসেনভাই সবার ছাতা বাসের ছাদে বেধে নিয়েছিলেন। নাহ, ছাতা হারায়নি একটাও। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো অধিকাংশ ছাতা প্রায় একই রকম হওয়ায়। কোনটা যে কার তা আর চিহ্নিত করা যাচ্ছিল না। অগত্যা প্রত্যেকেই একটা করে ছাতা নিয়ে নিলাম।

অন্য সবার কথা জানি না আমার খুতখুতে মন খুব খারাপ হয়েছিল। অনেক সুখ, আনন্দ, স্বস্তি–শান্তি ও কষ্টের সাক্ষী আমার ব্যবহৃত ছাতাটাই যে আমি পেয়েছি তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবুও সান্ত্বনা, ছিয়াশি সালে হজে ব্যবহৃত ছাতাগুলোর একটার মালিক তো আমি যা এখনো আমার কাছে সংরক্ষিত আছে।

ওয়ারী, ঢাকা থেকে

শ্রদ্ধা

– মোহাম্মদ হারুন–অর–রশিদ

তখন কলেজে পড়ি। আমাদের সহপাঠী হায়দারের সঙ্গে কামালের ভীষণ তর্কাতর্কি শুরু হলো। তর্কাতর্কি থেকে মারামারি। কামাল ইঞ্জিনিয়ার বলেছে হায়দারকে। ইঞ্জিনিয়ার বলার জন্য ঝগড়া, তারপর মারামারি। এর কারণ হিসেবে পরে জানতে পারলাম হায়দারের আদি বাড়ি গোপালগঞ্জে। ফরিদপুর, গোপালগঞ্জের লোকদের, বিশেষ করে খুলনা অঞ্চলের লোকরা ইঞ্জিনিয়ার বলে খেপায়। কেউ কেউ এদেরকে ছাতা *ইঞ্জিনিয়ার*ও বলে। গোপালগঞ্জ, ফরিদপুরের কিছু লোক পুরনো ভাঙা ছাতা সারায় বা মেরামত করে। কাজটি প্রধানত এই অঞ্চলের লোকরাই করে।

যে শ্রেণীর লোকরা ছাতা সারায় তারা অত্যন্ত গরিব। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, দ্বারে দ্বারে ঘুরে এরা ছাতা সারায়। নিজের জীবন–জীবিকা চালায়। সংসার চালায়। শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করা, তাদেরকে হেয় করা, সেই কলেজ জীবন থেকেই আমার খারাপ লাগতো, এখনো লাগে। তা সে মানুষ যে অঞ্চলের হোক না কেন? খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষকে আমাদের শ্রদ্ধা করা উচিত।

খুলনা থেকে

ফেয়ারওয়েল

– দেওয়ান সায়েম

ছাতা নিয়ে সবচেয়ে বড় রসিকতা হচ্ছে চাকরি থেকে অবসর নেয়ার দিন সেটা কাউকে উপহার দেয়া। বাস্তবে এই সময়ে এসে ছাতার কাজ ফুরোয়। আমার বাবার সঙ্গে এই রসিকতাটা করা হয়েছে।

বাবার একটা অভ্যেস ছিল ছাতা হারানো। প্রতি বর্ষায় তিনি একটি করে ছাতা কেনেন। বর্ষা পার হওয়ার আগেই সেটা হারিয়ে যায়। ছোট ধরনের চাকরি বলে এক বর্ষায় দুটো ছাতা কেনার উপায় থাকে না। তাই ছাতা হারিয়ে অবশিষ্ট বৃষ্টি–বাদলার দিনে কাকভেজা হয়ে তিনি অফিস যাওয়া আসা করেন।

মা প্রতি বর্ষায় নতুন ছাতা কেনার পর সযত্নে সেটায় সুই সুতোর কারুকার্যে বাবার নামটা খোদাই করেন। নামসহ ছাতা গায়েব হয়। কোনো একদিন অপরাধীর ভঙ্গিতে বৃষ্টিভেজা হয়ে বাবা ঘরে ফেরেন। এ নিয়ে আমাদের ভাইবোনের মাঝে রীতিমতো হাসাহাসি চলে। কোনো কিছু হারিয়ে যাবার পর আমরা তামাশা করে বলি, *বাবার ছাতা।* এটা যেন আমাদের পারিবারিক একটা প্রবাদ।

বাবার অবসর নেয়ার দিন তার সঙ্গে আমিও অফিসে গিয়েছিলাম। বাবা বিদায় সংবর্ধনা নেয়ার উদ্দেশে পুরোদস্তুর তৈরি হয়ে ঘর ছাড়েন। মোস্তফার লন্ড্রি থেকে পুরনো পাঞ্জাবি ধুয়ে নিয়ে এসেছেন। বয়েসী পাঞ্জাবি মোস্তফার হাতে যত্ন করে ধোয়ায় ধবধবে শাদা হয়ে ওঠে। এটা গায়ে চাপিয়ে, চোখে সুরমা আর কম দামি আতরের দম বন্ধ করা গন্ধ শরীরে মেখে আমাকে সহ তিনি অফিসে হাজির হন। অফিসে পৌছে অল্প সময়েই বুঝে উঠতে পারি বাবার বিদায় সংবর্ধনার ব্যাপারে এখানকার কারো তেমন কোনো আগ্রহ নেই। সবাই যে যার কাজে বড় বেশি ব্যস্ত। বাবাকে দেখে কি, কেমন আছেন, ভালো তো? এই বলে সবার দায়িত্ব ফুরোয়।

২২ বছর এক অফিসে চাকরি জীবন কাটিয়ে দিয়ে বিদায় দিনে বাবার প্রথম উপহার সবার ভুলে যাওয়া ভঙ্গিমা। ব্যাপারটা বাবার চোখেও ধরা পড়ে। তিনি খানিকটা বিব্রত বলে মনে হয়। হয়তো আমি সঙ্গে আছি বলে সেটা আরো অপমানকর। আমাকে নিয়ে এবার তিনি অফিস ম্যানেজারের কামরায় আসেন। ম্যানেজার সাহেব যেন অন্য সবার চেয়ে বেশি ব্যস্ত। এতো ব্যস্ত যে, বাবাকে বসতে বলার ফুসরত তার হয় না। বাবা সম্ভবত এই ব্যক্তিকে ভয় পান, চাকরিকাল ফুরিয়ে এলেও ভয়টা এখনো ফুরায়নি। তাই মিনমিনে স্বরে বলেন, স্যার, আমার ফেয়ারওয়েল?

ম্যানেজার হই হই করে ওঠেন। হ্যা, হ্যা তাই তো। আপনি গিয়ে অন্য কোনো টেবিলে বসুন। হাতের কাজ গুছিয়ে নিয়ে ফেয়ারওয়েল দিয়ে দেবো।

বাবা আগে যে চেয়ারটায় বসতেন সেখানেই আসি। এই চেয়ারে নতুন একজন মানুষ বসে আছেন। তিনি বাবাকে চিনতে পারেন, তাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ান। হাসি হাসি মুখে বলেন, দেখুন, কেমন আপনার চেয়ারে বসে আছি। আমি বুড়ো হলে আরেকজন এসে এখানে বসবে, তার চেয়ে বরং কম বয়সে মরে যাওয়া ভালো। নিজের চেয়ারে অন্যের বসে থাকার দৃশ্যটা দেখতে হয় না। বুঝলেন ভাইসাহেব, নিজের স্থানে অন্যের অবস্থান দেখতে পাওয়া এ পৃথিবীর দুই চারটে নিষ্ঠুর দৃশ্যের একটি।

ভদ্রলোকের ব্যবহার আমার ভালো লাগে। অন্তত এই একজন কথায় হলেও বাবাকে মূল্যায়ন করেন। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়, ক্যান্টিন থেকে চা আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে খানিক সময় আর সব কাজ ফেলে রেখে বাবার সঙ্গে তিনি এটা-সেটা নানান বিষয়ে গল্প করেন। এরপর তারও ক্লান্তি আসে। তবুও ম্যানেজার সাহেবের হাতের কাজ ফুরোয় না।

এদিকে দুই চারজন কর্মকর্তা কাজ সেরে উঠে দাড়ান। চলে বিদায়কালীন প্রস্তুতি। এরা চলে যাচ্ছে, দৃশ্যটা পীড়াদায়ক। এরা যদি চলে যায় তাহলে বাবাকে সংবর্ধনা কে দেবে, অফিসের চেয়ার টেবিল? এবার ক্ষীণস্বরে বলি, বাবা, চলো ফিরে যাই।

আমার কথায় বাবা সম্ভবত আহত হন। ফেয়ারওয়েলকে তিনি তার অধিকার হিসেবে ভেবে বসে আছেন। ২২ বছরে জন্ম নেয়া বিরাট অধিকার।

শেষমেষ ম্যানেজার সাহেবের হাতের কাজ শেষ হয়। ততোক্ষণে অফিসেরও ছুটি। মাত্র জনাপাচেক কর্মকর্তা অবশিষ্ট থেকে গেছেন। এদেরও যাবার উপক্রম। বাবা দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় নির্বাক হয়ে বসে আছেন। হিসাব বিভাগের এই কর্মকর্তার অবসরে যাবার সময়ে যেন হিসাব মিলছে না। সারা জীবন যোগ বিয়োগের নির্ভুল খেলা খেলে এবার জীবনের অংকে বিরাট ঘাপলা। বিষয়টি বাবার চেয়ারে বসে থাকা নতুন এই কর্মকর্তার চোখে ধরা পড়ে যিনি এই অফিসের একমাত্র সদয় ব্যক্তি।

এবার তিনি উঠে দাড়ান। ম্যানেজার সাহেবের কামরায় গিয়ে কি যেন কথা বলেন। দুইজনে এক সঙ্গে বেরিয়ে আসেন। অফিসে কর্মকর্তাদের স্বল্প উপস্থিতি দেখে ম্যানেজার সাহেব কিছুটা লজ্জা পান হয়তো। বাবার কাছে এসে বলেন, দেখুন দেখি কাণ্ড। সবাই চলে গেছে। ঠিক আছে, আপনাকে অন্য আরেকদিন ফেয়ারওয়েল দিয়ে দেবো, সেদিন বিশাল আয়োজন হবে।

আজীবন অভিমানহীন বাবা ম্যানেজার সাহেবের কথায় হঠাৎ অভিমানী হয়ে ওঠেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, স্যার, আমার আর ফেয়ারওয়েলের প্রয়োজন নেই।

বাবার কথায় হই হই করে ওঠেন ম্যানেজার সাহেব। আরে নাহ! তা কি কখনো হয়। আপনাকে দেয়ার জন্য উপহার পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আজ শুধু উপহার নিয়ে যান, আগামী সপ্তাহে বিদায় সংবর্ধনা দিয়ে দেবো।

বাবাকে অন্য কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ম্যানেজার সাহেব তার রুম থেকে উপহারটা নিয়ে আসেন একটা ছাতা। বিশেষত্বহীন একটা ছাতা। ইদ্রিস কম্পানির ছাতা বলে সেটার গায়ে গোটা গোটা অক্ষরে ইদ্রিস সাহেবের নামটা লেখা।

ম্যানেজার সাহেব বাবার হাতে ছাতাটা তুলে দেন। কিছু বোঝার আগেই কে যেন এমন সময় হাততালি দিয়ে ওঠে। তার দেখাদেখি বাকি যারা ছিল তারাও হাতে তালি দেয়।

রিকশা করে ফেরার পথে বাবা খুব শক্ত হাতে ছাতাটা আকড়ে ধরেন যেন হাত আলগা করলে হুট করে হারিয়ে যাবে এটি। বাবার চোখের কোণে জলের খেলা। জানি, এই বিশেষত্বহীন ছাতা কখনো না ভিজবে বৃষ্টির জলে, না পুড়বে রোদে। একে যত্ন করে তুলে রাখা হবে আলমারিতে। মাঝে মধ্যে খুব মন খারাপ হলে এই ছাতা হাতে নিয়ে একা হবেন বাবা। তখন শুধু এই ছাতা ভিজবে, ভিজবে দুই একটা ফোটা চোখের জলে।

খাসদবীর, সিলেট থেকে

সুগন্ধ

--বাবু

দেশ থেকে দূরসম্পর্কের খালাতো বোন দীপা এসেছে। মা বললেন দীপাকে চা বাগানে ঘুরিয়ে আনতে।

বৃষ্টির দিন। তাই ঘুরতে যাওয়ার সময় সঙ্গে একটা ছাতা নিলাম। চা বাগানে গিয়ে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির দেখা পেলাম। ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে বাসায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। ইতিমধ্যে বৃষ্টি খুব বেড়ে গেল। দেরি না করে দীপার মাথায় ছাতা ধরলাম অথচ এলোমেলো বৃষ্টিতে আমরা দুজনেই ভিজে যাচ্ছিলাম। খুব কাছাকাছি হাটছিলাম বলে বৃষ্টি এবং ঘামে ভেজা দীপার শরীরের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিলাম। বৃষ্টিতে ভিজে তার ব্রা এবং শরীরের ভাজগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

দীপাকে তার শরীরের গন্ধের কথা বলতেই সে খিলখিল করে হেসে উঠলো। গায়ে চিমটি কেটে বললো, এখন বাগানে মালী নেই, যতো খুশি ফুলের সুগন্ধ নিতে পারো, কেউ কিছু বলবে না।

ছাতা ফেলে দীপার বুকের ভাজে নাক ডুবিয়ে গন্ধ নেয়ার নেশায় বুদ হয়ে রইলাম। পাশে ফেলে রাখা ছাতাটি আমাদের ঘটনার নীরব সাক্ষী হয়ে রইলো।

বৃষ্টি অথবা রোদে যখনই ছাতাটি নিয়ে কোথাও বের হই তখনই দীপার কথা খুব মনে পড়ে। সেই সঙ্গে জোরে নিঃশ্বাস নিলে তার শরীরের সেই মিষ্টি গন্ধটাও ভেসে আসে।

মৌলভীবাজার থেকে

বাবা

– মোহাম্মদ রুহুল আমিন

ষাটোর্ধ বয়সের বাবা ছিলেন আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে ছয় মাইল দূরের একটা হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক। ১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি সবেমাত্র নিজ গ্রামের প্রাইমারি স্কুল থেকে ক্লাস ফাইভ পাস করে বাড়িতে বসে আছি ভর্তির অপেক্ষায়। আমাদের গ্রামে বা তার আশপাশে তখন কোনো হাই স্কুল ছিল না বলে আমাকে নিয়ে বাবা যেন বেশ সমস্যাই পড়ে গিয়েছিলেন। বহু ভাইবোনের বিশাল সংসারে টাকার অভাব ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই বাবার কাছে নিয়ে হস্টেলে রেখে আমাকে পড়াবেন এমন কল্পনাও তিনি করতে পারতেন না। এছাড়া তিনি থাকা-খাওয়া এবং ছাত্র পড়ানোর বিনিময়ে স্কুলের কাছেই এক বাড়িতে লজিং থাকতেন।

এক বৃহস্পতিবার বাবা বাড়িতে এলেন। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গ্রামের বাড়িতে অনেক রাত। ছোট ভাইবোনেরা কুপি জ্বালিয়ে সুর করে কবিতা পড়ছে। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তোর জন্য একটা লজিং ঠিক করেছি স্কুলের কাছেই। আগামী শনিবারই তোকে আমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো।

এতোদিন ভালোই ছিলাম। একবেলা, আধবেলা না খেয়ে কাটলেও আমাদের গ্রামটা ছিল আমার কাছে খুব প্রিয়। ঘুড়ি উড়ানো, নাড়া ক্ষেতে গোল্লাছুট, ফুটবল খেলা, বাড়ির পাশের ডোবা-নালায় কাদাপানিতে কই, ট্যাংরা, পুটি মাছ ধরা, বর্ষার নতুন পানিতে স্রোতের বিপরীতে দুরন্ত সাতার কাটা, প্রতিবেশীর গাছ থেকে ফলমূল চুরি করে খাওয়া, পাখি শিকার করা এমন আরো কতো কি যে আমার কৈশোর জীবনের সঙ্গে মিশে ছিল তা এখনো ভাবলে আমার মনটা হাহাকার করে ওঠে।

যাহোক, বাবার কথায় আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সবেমাত্র ক্লাস ফাইভ পাস করেছি। কি এমন বয়স! অথচ এ বয়সেই আমাকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে আরেক বাড়িতে লজিং থাকতে হবে!

শনিবারে সকালেই আমরা পিতা-পুত্র যাত্রা শুরু করলাম। কখনো বা গ্রামের মেঠো পথ আবার কখনো বা শিশির ভেজা দূর্বা ঘাসের রাস্তা মাড়িয়ে এক সময়ে আমরা স্কুলে পৌছে গেলাম। বাবা অন্য স্যারদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

স্কুল ছুটির পর বাবা আমাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন স্কুলের পাশ ঘেষে যাওয়া ছোট খালের ওপর বাশের সাকো পেরিয়ে একটু দূরের গ্রামে। সেখানেই আমার লজিং ঠিক হয়েছে। সেই বাড়িটাও ছিল আমাদের গ্রামের মতোই একেবারে গণ্ডগ্রাম। আমার একটুও ভালো লাগছিল না। এক বাড়িতে এক ঘরে বসবাস। কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে আদুল গায়ে ঘোরাঘুরি করছিল আশপাশে। জানলাম এরাই আমার ছাত্রছাত্রী। অথচ বয়সে আমি প্রায় তাদেরই সমান।

বাড়ির উঠোনটা চারপাশ ঘিরে গহীন বন-জঙ্গল। আমার একটু ভয় লাগছিল। বোধহয় বাবা আমার অবস্থা অনুমান করেছিলেন। মাথা ও পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, সময় এবং সুযোগ এলেই তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো।

মাথা তুলে বাবার দিকে তাকাতেই দেখি তার দুই চোখ পানিতে টলটল করছে। আমিও কেদেছিলাম। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমাকে রেখে বাবা তার গন্তব্যে চলে গেলেন। পরদিন স্কুল ছুটির পর বাবার সঙ্গে দেখা করলাম স্কুলেই। লজিংয়ের পথে রওনা দেবো এমন সময়ে বাবা কি যেন একটু ভাবলেন। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি চলে গেলেন শিক্ষক মিলনায়তনে। এবং একটু পরেই ফিরে এলেন একটা ছাতা হাতে। এটা আমার বাবার ছাতা। বহু বছর আগের কেনা। দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে বিবর্ণ

এবং দুই এক জায়গায় তালি দেয়া। বাবা ছাতাটা এগিয়ে দিলেন আমার হাতে। এবং বললেন, গ্রামের রাস্তা, এখনো প্রখর রোদ, ছাতাটা মাথায় দিয়ে যা।

ছাতাটা নিয়ে আমার লজিং বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। একবারও ভাবলাম না আমি ছাতাটা নিয়ে গেলে বাবার কি হবে। বয়সের ভারে, অভাব-অনটনে তিনি এমনিতেই বিপর্যস্ত। তাকে কি আমার আরো কষ্ট দেয়াটা ঠিক হয়েছে! লজিং বাড়িতে ফিরে এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন স্কুলে গিয়েই বাবাকে ছাতাটা দিয়ে বললাম, আমার ছাতার প্রয়োজন নেই। এটা আপনিই ব্যবহার করুন।

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, তার ছাতাটার দরকার নেই। কারণ তার লজিং নাকি আমার লজিং থেকে অনেক কাছে এবং আমার এই ছোট শরীরে নাকি রোদের তাপ সহ্য হবে না।

এরপরও বাবাকে ছাতাটা দিতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাবা আমার সে ছাতা আর কোনোদিন ফেরত নেননি।

আমার বাবা প্রয়াত হয়েছেন আজ বহু বছর। বাবার দেয়া সেই ছাতা দিয়ে কতো যে ঝড়-বৃষ্টি পার করেছি, রোদ থেকে নিজেকে বাচিয়েছি তার শেষ নেই। বাবার মৃত্যুর পর এখনো ছাতার প্রসঙ্গ এলেই মনে পড়ে একজন পিতার পুত্র স্নেহের কথা এবং এখনো এই পঞ্চাশোর্ধ বয়সে সে স্নেহে অবগাহন করি।

উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে

হাতিয়ার

– জয়া স্কাইয়া

বন্ধু মহলে অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম একটি বিশেষ কারণে আমার বেশ সুনাম রয়েছে। আর এর কারণ হলো আমার একটি ব্যাগ। এটি *তেলেসমে হোসরুবা* সিরিয়ালের জাদুকর পামরি-র জাদুর থলের মতো। প্রয়োজনের সময় যখন যা ইচ্ছা তা সে জাদু-মন্ত্র পড়ে বের করে আনে। আমার এ ব্যাগটিও সে রকম।

আমি কোনো জাদু জানি না। আমার ব্যাগটিতে প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই রাখি। এ জন্য যখন যারই যা কিছু প্রয়োজন হয় তা বের করে এনে সহায়তা করতে পারি। এ নিয়ে সবাই বেশ হাসাহাসি করে আবার প্রশংসাও করে। অবশ্য আমাকে এতো প্রশংসার ভার বইতে খুব কষ্ট হয়। কেননা এতো জিনিসপত্র ব্যাগে ভরতে ভরতে ব্যাগটি খুব ভারী হয়ে যায়। অতোটাও হতো না যদি এতে একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে না হতো। এতো ভার বইতে বইতে আমার কাধটি প্রায়ই ব্যথা করতে থাকে। অনেক কিছুই বাদ দিতে পারি। কিন্তু এটাকে ব্যাগে ঢোকানো বাদ দিতে পারি না।

সেটি কি? তা অবশ্য সবারই জানার কথা। কেননা ইদানীং অনেকেই এটাকে তাদের ব্যাগে বহন করেন। তবে আমি এটাকে শুধু বহন করি না, যথাযোগ্য ব্যবহারও করি। আমি মাইগ্রেন-এর রোগী। এটি আমার লাগে। রোদে মাথার ওপর এটাকে মেলে না ধরলে আমার রক্ষা নেই। সে দিনটি আমি আর কোনো কাজ করতে পারি না। সারা দিন মাথা ব্যথা নিয়ে কাটে।

বৃষ্টির দিন এটি সঙ্গে থাকলে বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেয়েও আরো একটি বড় সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বৃষ্টিতে বাস থেকে নেমে রিকশা ভাড়া করতে গেলে এটি হাতে থাকলে রিকশাচালক অযৌক্তিক ভাড়া চেয়ে পার পায় না।

ছাতা নিয়ে আমার একটি মজার ঘটনার কথা বলছি। ১৯৯৭ সালের কথা। একদিন তিন বোন মিলে ইংলিশ স্পোকেন ক্লাস থেকে রিকশা করে বাড়ি ফিরছি। তখন সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে হবে। সায়দাবাদ-যাত্রাবাড়ি একটু বেশি ট্রাফিক জ্যাম হতো। সিগনাল পড়লে তো কথাই নেই, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হতো। এ সময় রিকশাটি যদি রোডের মাঝে না থেকে ফুটপাথের ধার দিয়ে থাকতো তাহলে বেশ সতর্ক হয়ে বসে থাকতে হতো অনাকাঙ্ক্ষিত আক্রমণের আশঙ্কায়। রাস্তার পাশ দিয়ে হেটে যাওয়া কিছু অসৎ লোক হয় হাত লাগিয়ে যাবে, নয় খোচা মেরে যাবে। সেদিন খুব সতর্ক হয়ে বসে আছি। এমন সময় একটি লোক পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় নিজের হাতটি আমার হাতে লাগিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সেই মুহূর্তে আমার হাতে ছিল আমার এই অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ারটি। এটি সেই মুহূর্তে হাতিয়ারের রূপ ধারণ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটি দিয়ে লোকটিকে বাড়ি মেরে বসলাম। এই ধরনের বাজে লোকগুলো খুব ভীতু থাকে। চট করে বাড়ি মারার কারণটি বুঝিয়ে দিলাম।

বাড়ি খেয়ে লোকটি বলতে লাগলো, আপা ভুল বুঝলেন?

বাড়ি আসার পর তিন বোন বাসার সবাইকে গর্বের সঙ্গে মজা করে গল্পটি বলতে বলতে হাসিতে ফেটে পড়লো। এমন কেউ নেই যাকে তারা গল্পটি বলেনি। এবং আমার নাম দিল *ছাতাওয়ালি।*

বাংলামোটর, ঢাকা থেকে

চতুরঙ্গ

– মির্জা মতিউর রহমান

এক.

ছেলেবেলার কথা। জীবনে প্রথম ছাতা মাথায় বরযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল এসময়। *বিয়ে* বা *বরযাত্রী* শব্দ দুটিতে যে একটা উৎসব উৎসব, জাকজমক ভাবের চমক থাকে তেমন নয়। গাড়ি, ঘোড়া অথবা আতশবাজির সমারোহ এসব কিছুই ছিল না। বরপক্ষ অথবা কনেপক্ষ কারোরই সামর্থ ছিল না এসব বিলাসিতার। নেহায়েতই শাদামাটা গ্রাম্য বিয়ে।

একুশ জনের বরযাত্রী, সিঙ্গল লাইনে পদযাত্রা। সবার মাথায় টুপি, ছাতা। আমার মতে, আমারটাই গ্রামের সেরা ছাতা। ছাতার আটটি খোপের দুটিতে লাল রঙ-এর কাপড়, অপর ছয়টিতে ছয় রঙ-এর সমাহার। ছাতার বাটের বাকা অংশ পিতল দিয়ে মোড়ানো, চকচকে সোনালি আভা ছড়ায়। স্কুল, বাজার যেখানে গেছি সেখানে সবাই আমার ছাতার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতো, বিশেষ করে আমার মতো ছোটরা। আমার ছোট্ট বুকখানা ছাতার গর্বে ভরে যেতো।

পরিচিত অনেক ছেলেমেয়েই আবদার করতো আমার সঙ্গে আমার ছাতার নিচে কিছুক্ষণ থাকার বা পথ চলার। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আবদার করতো বাকানো পিতলের অংশে হাত দিয়ে স্পর্শ সুখ অনুভব করার জন্য। আমি সগর্বে অনুমতি দিতাম। কিন্তু সাবধান করে দিতাম হাতে যেন ময়লা না থাকে। মহা আনন্দে পথ চলছি। বিয়ে বাড়ি এসে গেল। সামর্থ অনুযায়ী আদর আপ্যায়নের কমতি ছিল না।

বড়দের দেখাদেখি আমিও বিয়ে বাড়ির টিনের ঘরের টানা বারান্দার এ মাথা হতে অন্য মাথা পর্যন্ত খুটির সাপোর্টে যে বাশ তার সঙ্গে ছাতা ঝুলিয়ে রেখেছি।
বিয়ে শেষে খাবার পর যাত্রার প্রস্তুতি। নতুন বৌকে ডুলিতে উঠানো হচ্ছে। সবাই যার যার ছাতা হাতে নিচ্ছে। সর্বনাশ! আমার ছাতা বারান্দায় ঝোলানো নেই। খোজা হলো, কোথাও নেই। মুরব্বিরা বিয়ে বাড়ির লোকদের জানালো। নতুন আত্মীয়। মাথায় হাত দিয়ে বসলো তারা লজ্জায়। এখানে দেখো, সেখানে খোজো। কিন্তু ছাতা কোথাও পাওয়া গেল না। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে আমার সেকি কান্না ছাতার শোকে। কান্না আর থামে না। পাড়াতো এক জেঠা আমাকে নতুন বৌ-এর ডুলিতে উঠিয়ে দিল। নতুন বৌ আমাকে বুকে নিয়ে কতো আদর করলো। আমি কেদেই চলেছি। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বাড়িতে আসার পর আবারও কান্না শুরু। অবশেষে আব্বা কথা দিলেন সেই ছাতার চেয়েও সুন্দর একটা এনে দেবেন। কান্না থামলো। জীবনে অনেক হারাতে হয়েছে। আজ এ বার্ধক্য এসেও কোনো ছেলেমেয়ের হাতে রঙিন ছাতা দেখলেই ছেলেবেলার সেই হারানো ছাতার স্মৃতি মনে পড়ে।

দুই.

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। আন্তঃকলেজ ফুটবল ফাইনাল খেলা। বগুড়া আযিযুল হক কলেজ বনাম রাজশাহী সরকারি কলেজ। বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে খেলা চলছে। তখন স্টেডিয়াম হয়নি। মাঠ ঘিরে হাজার হাজার দর্শকের সমাগম। খেলা শুরু হলো। আমাদের বগুড়া কলেজ টিম উচ্চমানের। কিন্তু লোকাল টিমের বিরুদ্ধে খেলা যে কি বিড়ম্বনা তা শুধু ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। রাজশাহীর দর্শকদের উল্লাস, চিৎকারে মাঠে কান পাতা যায় না এমন অবস্থা।
আমাদের সমর্থক বলতে মাঠের সাইড লাইনের বাইরে বসা অতিরিক্ত পাচজন খেলোয়াড়, একজন টিম বেয়ারা এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চেয়ারে মুখ কালো করে বসে আছেন আমাদের টিম ইনচার্জ স্যার। টিমের সবাই একটু ঘাবড়ে গেছি। খেলা শুরু হলো। আস্তে আস্তে আমাদের টিমের খেলার স্পিড বাড়ছে। রাইট আউটে খেলি। তাই সাইড লাইনের পাশে বসা দর্শকদের কটূক্তি, গালাগালি হজম করতে হচ্ছে বেশি। বিশ মিনিটের মতো খেলা হয়েছে। আমার টিমের রাইট ইন অমলেশ (জাতীয় দলের খেলোয়াড়) চমৎকার একটা বল ঠেলে দিয়েছে। সাইড লাইনে বলটা নিয়ে সোজা দৌড়ে রেইনবো কিক করলাম। গোলরক্ষককে পরাজিত করে কোণা দিয়ে বল জালে। সারা মাঠ নীরব।
আবার খেলা শুরু। পাচ মিনিট পর আরো একটা বল পেয়েছি। বল নিয়ে সাইড লাইন দিয়ে তীর বেগে ছুটছি। হঠাৎ কিসের টানে ছিটকে পড়লাম। পরে বুঝেছি ছাতার বাকা মাথা দিয়ে সাইডে বসা দর্শক পায়ে টান দিয়েছে পেছন থেকে। পড়ে যাবার পর মাথায় প্রচণ্ড এক বাড়ি ছাতার কাঠের হ্যান্ডলের। আর কিছু মনে নেই।
সাতটা সেলাই দিতে হয়েছিল। রাজশাহীর সদর হাসপাতালের বেডে শুয়ে মনে হয়েছিল ছাতা শুধু ঝড়-বৃষ্টি-রোদের জন্য নয়, কখনো কখনো অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার হয়।

তিন.

১৯৬৮ সাল। মারি হিলস। আর্মি স্কুল অফ অ্যাডমিন কুলুডানা হিলস। ছয় মাসের কোর্সে গেছি। আগামীকাল ছুটি। আমি আর রুমমেট এফজি খটক প্ল্যান করলাম, কাল ভোরে পিণ্ডি পয়েন্টে

সূর্যোদয় দেখতো যাবো। কথা মতো ব্যাটম্যান ভোর চারটায় জাগিয়ে দিল। খটক–কে জাগানোর জন্য ধাক্কা দিলাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সে আরো ভালোভাবে কম্বল জড়িয়ে পাশ ফিরে ঘুমালো। আবার একটা ধাক্কা দিলাম। এবার নাকি সুরে জবাব দিল, দোস্ত, প্লিজ, তোম একেলা যাও।

অগত্যা ট্রাকসুট পরে পায়ে কেডস, মাথায় মাংকি ক্যাপ দিয়ে বের হলাম। জগিং করতে করতে পিণ্ডি পয়েন্টে পৌছে গেলাম। আবছা আধার, ঘন কুয়াশায় আরো অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সব কিছু।

হিলটপে পৌছানোর আগেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি শুরু হলো। হিলটপে পৌছে হাপিয়ে গেলাম। সূর্যোদয় দর্শনার্থীর তীব্রতা তেমন একটা নেই। বিভিন্ন গাছের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দুই চারজন। কোথাও এক রেইন কোটের নিচে জড়িয়ে আছে তিনজন, কোথাও একই ছাতার নিচে জোড়ায় জোড়ায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। একটা ঝাকড়া *ওক গাছ* টার্গেট করে এগোলাম। দুর্ভাগ্য, আমার এখানেও খালি নেই। একজন ছাতা মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে। অগত্যা আমিও একটু দূরত্ব রেখে দাড়ালাম বৃষ্টির হাত থেকে বাচার জন্য।

মেয়েলি কণ্ঠে আওয়াজ এলো, কাম অন ম্যান, লেটস শেয়ার।

এক পা এগোলাম। আপাদমস্তক ব্রান্ডি কোটে জড়িয়ে ছাতার নিচে বসা মূর্তিটি আওয়াজ না দিলে বুঝতেই পারতাম না যে মহিলা নাকি পুরুষ। সঙ্কোচের সঙ্গে ছাতার এক অংশের ভেতর ঢুকলাম।

ছোট্ট জাপানি ছাতা গায়ে গায়ে লাগার মতো অবস্থা। তার বাম হাতে ছাতা ধরা, ডান হাতে আমার কোমর পেচিয়ে টান দিয়ে আরো কাছে নিয়ে বলছে, টেক ইট ইজি অ্যান্ড রিলাক্স।

মাঝে কোনো দূরত্ব নেই। মাংসল উরুর স্পর্শ পাচ্ছি। বুকে পিন্ডি হিলসের শৃঙ্গের ধাক্কা লাগছে।

বললো, স্মোক?

নো বললাম।

দেন হেলপ মি বলে আমার ডান হাত ধরে কোটের বুকের কাছের খোলা অংশে ঢুকানোর জন্য টানছে, কানের কাছে মুখ এনে বলছে, আই উইল শাউট আদারওয়াইজ।

জমে গেলাম। মনে মনে খটকের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করছি। হাত ঢুকিয়ে পিণ্ডি পয়েন্টের শৃঙ্গের অস্তিত্ব পেলাম। এবং গেঞ্জির পকেটে পেলাম এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট আর লাইটার। আমার হাত থেকে নিয়ে নিজে একটা নিল, আমার দিকে একটা বাড়িয়ে দিল।

নো বললাম।

দেন টেক ইট।

কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখি আমার গলা দুই হাতে পেচানো। ঠোটের ওপর দুটি তপ্ত ঠোট।

এক ঝটকায় খাড়া হলাম।

প্লিজ বলে হাত ধরলো, লাইটার জ্বেলে একটা কার্ড দিল হাতে। প্লিজ, মিট মি হিয়ার।

কার্ডে লেখা ডেইজি গোমেজ, খাইবার হোটেল, মল রোড, রুম ১৬। কার্ডটা তার মুখে ছুড়ে আমি ছাতার নিকুচি করলাম। দৌড়ে পিণ্ডি পয়েন্ট থেকে নিচে নেমে গেলাম।

চার.

শ্রাবণের ধারা ঝরছে অঝোরে। জানালা খুলে বৃষ্টি ঝরার সৌন্দর্য উপভোগ করছি আর গুন গুন করছি। *এমন দিনে তারে... ।* গিন্নির ঝঙ্কার, বাজার না হলে দুপুরে খাবার জুটবে না। না! কিছুই বলা হলো

না। মানিব্যাগে হাত দিয়ে দেখি শূন্য। সিদ্ধান্ত নিলাম ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে সরাসরি বাজারটা সেরে আসবো।

ছেলে বিদেশ থেকে সুন্দর একটা দামি ছাতা এনেছিল। সেটা নিয়ে বের হতেই গিন্নির মন্তব্য, তোমার যা ভুলো মন তাতে নির্ঘাত ছাতাটা হারিয়ে ফেলবে।

বললাম, তাহলে কি এই তুমুল বর্ষায় ভিজে গিয়ে মোড়ে রিকশা ধরবো!

মোড় পর্যন্ত পৌছাতেই আমি আর ছাতা উভয়েই বর্ষণসিক্ত। রিকশায় উঠে ব্যাংকে গেলাম। সোনালী ব্যাংক কর্পরেট শাখা, বগুড়া দোতলায়। বারান্দায় সশস্ত্র পুলিশম্যান। ভেতরে ঢুকতেই হা হা করে উঠলো। ভেজা ছাতা নিয়ে ভেতরে যাবেন না।

অগত্যা বারান্দার অনেক ছাতার ভিড়ে আমরটাও রেখে ঢুকলাম। সরকারি ব্যাংকে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে যে সময় লাগে এর চেয়ে অন্যর কাছে টাকা ধার পেতে অনেক কম সময় লাগে। আশা করি ভুক্তভোগীরা আমার সঙ্গে একমত হবেন। পঞ্চাশ মিনিট পর টাকা তুলে বারান্দায় ফিরে দেখি আমার ছাতাটা নেই, সেখানে একটা পুরনো ছেড়া লেডিস ছাতা। ইতস্তত করছি, ছাতাটা হারালাম।

পুলিশম্যান আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, চাচা, ছাতাটা আপনার নাতনি নিয়ে গেছে। এই যে চিরকুট!

চিরকুটে লেখা ,

দাদু!

বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি, তোমার নতুন ছাতাটাই নিয়ে গেলাম। তুমি আমার পুরনোটা নিয়ে বাসায় যেও। দাদি যেন চিন্তা না করেন।

লাভলী

বাজার সেরে বাসায় ফিরলাম। গেটে ঢুকতেই গিন্নির প্রশ্ন, ছাতাটা হারিয়েছো নিশ্চয়ই!

বললাম, না। আমার নাতনি নিয়ে গেছে।

শেখ হাসিনার গণভবন দখলের সংবাদে সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়েছিল যেমন বিস্ময়ে তেমনি মুখ করে গিন্নি শুধু বললো, আ-মা-দে-র না-ত-নি!

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

ইউনিভার্সিটির ছবি

– মানিক কাঞ্চন

দিনক্ষণ আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে এটা মনে আছে তখনো হেমন্ত আসেনি। শরতের মৃদুমন্দ হাওয়া এবং হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি। মোটামুটি প্রকৃতি ছিল এমনই। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। মনের তাগিদে অনুভব করলাম, সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানানো প্রয়োজন এমন গর্বের কথায়। কিন্তু দুনিয়ার সকলকে তো আর জানানো সম্ভব নয়। তাই আপাতত কিছু আত্মীয়স্বজনকে বেছে নিলাম প্রচার তালিকায়।

তালিকায় সবার প্রথমে মামাবাড়ি। রুটিন অনুযায়ী চলে গেলাম মামাবাড়ি। কুষ্টিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। বেশ কয়েকদিন থাকবো। সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে গেলাম। গ্রামের অদূরে পদ্মা নদী, নদীর ধারে বেড়ানো আমার ছোটবেলা থেকেই খুব পছন্দ। প্রতিদিন বিকেলে নদীর ধারে যাই। কখনো হালকা হাটাহাটি করি, কখনো চুপচাপ বসে থাকি। সন্ধ্যা হলে ফিরে আসি। ইতিমধ্যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হিসেবে সকলের কাছেই পরিচিত হয়ে উঠেছি। তাই সকলেই আমাকে একটু বাড়াবাড়ি রকমের মূল্যায়ন করতে লাগলো।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও নদীর ধারে হেটে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আকাশে কালো মেঘ। বৃষ্টি আসবে বুঝলাম। আমার কাছে ছাতা নেই। তাই মাতুলালয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হলাম। কিন্তু তা অতি কাছে নয়। হাটতে থাকলাম। অর্ধেক রাস্তাও এসে পৌছায়নি, এর মধ্যে নামলো বৃষ্টি। প্রথমে দ্রুত হাটতে লাগলাম, পরে দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়ে পৌছাতেও অনেক সময় লাগবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র বলে দৌড়াতেও লজ্জা পাচ্ছি। উপায়ন্তর না দেখে পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলাম।

এই বাড়িতে আমি নামে পরিচিত ছিলাম। তাছাড়া আমার মামা এই এলাকায় বেশ প্রভাবশালী। প্রথমে বাড়িটার দেয়ালের ধারে গিয়ে দাড়ালাম। কিন্তু বাড়ির গৃহকর্ত্রী আমাকে ধরে নিয়ে তাদের ঘরে নিয়ে বসালেন এবং একজনকে বললেন একটা তোয়ালে আনতে।

এক মিনিটের মধ্যেই একটি মেয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে এলো।

আমার হাতে দিতেই তার দিকে তাকালাম এবং বলা চলে প্রথম পলকেই পাগল হলাম। আমার বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। কিছুই বলা হলো না, তোয়ালেটা নিয়ে মাথাটা ভালোমতো মুছে নিলাম।

ইতিমধ্যে পাশের রুম থেকে একজন ভদ্রলোক এলেন যিনি মেয়েটির বাবা। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে খুব আন্তরিকভাবেই আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। আমাদের ইউনিভার্সিটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অনেক কিছু।

পুলকিত বোধ করলাম এবং সব বিষয়েই তার সঙ্গে মতবিনিময় করলাম। সময় এভাবে অনেক গড়িয়ে গেল। কিন্তু বৃষ্টি থামলো না। রাত হয়ে গেছে। তারা অনুরোধ করলো রাতটা তাদের বাড়িতেই কাটাতে।

তাদের আবদার বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলাম এবং অবশেষে তাদের কাছ থেকে একটা ছাতা ধার নিয়ে বিদায় নিলাম।

বিদায়ের সময় মেয়েটির দিকে একবার তাকালাম। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটা মিষ্টি একটা হাসি উপহার দিল। আমিও তার প্রতিউত্তর দিলাম। রাতে বাড়িতে ফিরে খাওয়া-দাওয়া করে মামা-মামি আর মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না। শুধু সেই মেয়েটির ছবি চোখের সামনে ভাসতে লাগলো। পরের দিন তাদের বাড়িতে গেলাম ছাতাটা ফেরত দিতে। ইচ্ছাকৃতভাবেই সন্ধ্যার সময় গেলাম। বাড়িতে ঢুকেই খালাম্মা বলে দুই তিনটা ডাক দিতেই ভেতর থেকে সেই কাঙ্ক্ষিত মুখ বেরিয়ে এলো।

সে মিষ্টি কণ্ঠে বললো, আরে আপনি! বসুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, খালাম্মা নেই?

সে বললো, কেউ–ই বাসায় নেই, সবাই আজ বিকেলে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে, হঠাৎ খুব অসুস্থতার সংবাদ শুনে।

খুশি হলাম এমন সুযোগ পেয়ে। বললাম, ছাতাটা ফেরত দিতে এলাম।

সে মিষ্টি হেসে বললো, শুধু এ জন্য অবেলায় আসা? আমার জন্য নয়?

এভাবে কথার এক পর্যায়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

তখন সে বললো, এতো উতলা হওয়ার দরকার নেই। আমি আজ সারা রাতই আপনার।

এ কথা বলার পর আরো পাগল হয়ে গেলাম। তাকে জাপটে ধরলাম। আমার বুকের মধ্যে তাকে নিয়ে তার সারা দেহ চুমুতে ভরিয়ে দিলাম আর আদিম খেলায় মেতে উঠলাম। সারা রাত চললো থেমে থেমে সেই খেলা। এভাবেই শুরু। এরপর লোকচোখের অন্তরালে কয়েক রাত লুকিয়ে সঙ্গ দিলাম তাকে। এক সময় ফেরার সময় হলো। তার কাছ থেকে অনেক ওয়াদা করে বিদায় নিলাম।

ঢাকায় এসে কিছুই ভালো লাগে না। বার বার তার কথা মনে আসে। কিছুতেই লেখাপড়ায় মন বসাতে পারি না। ছুটিতে সবাই বাড়িতে যায় আর আমি যাই মামার বাড়ি প্রথম কেউ সন্দেহ করতো না। কিন্তু ব্যাপারটা যখন নিয়মিতভাবে দেখা দিল তখন অনেকেই সন্দেহ করলো। বাড়িতে সবাই আমার ওপর ক্ষিপ্ত। সেখানেও জানাজানি হয়ে গেছে যে, ছুটিতে আমি ঢাকায় থাকি না, মামার বাড়িতে যাই। মামাবাড়িতেও সন্দেহ দেখা দিল আমাকে নিয়ে।

এক পর্যায়ে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। ঢাকাতে একটা টিউশনি করতাম। টিউশনি করলে ছুটি পাওয়া যায় না যখন–তখন। তাই ছেড়ে দিলাম টিউশনিটা। তার প্রতি আমার আকর্ষণ ভীষণ রকমের বেড়ে গেল। প্রতি মাসেই যেতে থাকলাম মামাবাড়িতে।

এরপরে ঘটেছে অনেক ঘটনা যা বলা শুরু করলে উপন্যাস হবে। তবে এখন আর মামাবাড়িতে একদমই যাই না। আমার গ্রামের বাড়িতে যাই ছুটি পেলেই। কারণ যার জন্য যাওয়া তার বসবাস এখন আমারই ছাতার তলায়।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

আমব্রেলাম্যান

– মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন

সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন–এর হাতে নাকি সব সময়েই একটা ছাতা শোভা পেতো। এ জন্য তার দেশের লোকেরা তো বটেই বহির্বিশ্বের অনেকেই তাকে *আমব্রেলাম্যান* উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ঠিক সেই রকম আমিও স্কুল জীবনে *আমব্রেলাম্যান* উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলাম। এবং সেই উপাধিটাও আবার দিয়েছিল আমারই খালাতো বোন শিলুফা। কারণ আমি বাইরে বের হলে প্রায় সময়ই ছাতা হাতে বের হতাম। তাই অনেকটা ইয়ার্কির ছলেই আমাকে এই উপাধিটা শিলুফা দিয়েছিল।

শিলুফা আর আমি এক সঙ্গেই স্কুলে যাওয়া–আসা করতাম। আমার থেকে এক বছরের ছোট ছিল এবং পড়তোও এক ক্লাস নিচে। এলাকার গার্লস হাই স্কুল না থাকায় আমাদের বয়েজ স্কুলেই তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন খালুজান। আমার ওপর দায়িত্ব বর্তানো ছিল, প্রতিদিন তাকে সঙ্গে করে

স্কুলে নিয়ে যাওয়া আবার নিয়ে আসা। বেশ অনেকটা পথই হেটে যেতে হতো। রাস্তাটাও ছিল গাছপালাহীন ফাকা মাঠের মধ্য দিয়ে। এ ব্যাপারটা ভেবে অনেক আগে থেকেই আব্বু আমাকে একটা ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। কাঠের বাটওয়ালা ছাতা। আমি সেই ছাতা মাথায় দিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম। কিন্তু ছাতা নামের এ বিশেষ বস্তুটাই ছিল শিলুফার দুই চোখের বিষ। ছাতা সে একদম সহ্য করতে পারতো না। ছাতা হাতে কাউকে দেখলেই সে কেমন জানি করে উঠতো। বলতো, দেখো, ছাতা হাতে ওঠানোটাই হলো একটা *চাষাড়ে* বা *ক্ষেত* মনমানসিকতা।

ইদানীংকালের বিচিত্র রঙয়ের ফোল্ডিং ছাতা দেখলে শিলুফা কি বলতো জানি না। কিন্তু সেই সময়ের কাঠ বা বাশের বাটওয়ালা ছাতা দেখলেই সে নাক সিটকিয়ে উঠতো একেবারে। সেই অতোটুকু বয়সে সে রকম একটা মানসিকতা তার মধ্যে কিভাবে জন্ম দিয়েছিল তা নিয়ে হয়তো মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু এক সঙ্গে চলার সময় বৃষ্টি-বাদল কিংবা প্রখর রোদে আমার ছাতার নিচে সে অবলীলায় এসে ঠাই নিতো এবং একই সঙ্গে দুজন পাশাপাশি পথ চলতাম। তখন অবশ্য এ নিয়ে উল্টো তাকে দুকথা অবশ্যই শুনিয়ে দিতে পারতাম। সেটা করতাম না। কারণ এতে করে রেগে গিয়ে আমার ওপর অভিমান করে বসতে পারে। মেয়েদের অভিমান আবার আমার কাছে খুব খারাপ লাগতো।

শিলুফা ছিল খুব টরটরে স্বভাবের মেয়ে। তার কথার সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না। সে যেটা বলবে সেটাই ঠিক। হয় মানো, না হয় না মানো তাতে তার কিছুই যায় আসে না। ছাতার বহুবিধ ব্যবহার সম্পর্কে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। দেখ শিলু ছাতা কতোভাবে মানুষের প্রয়োজনে লাগতে পারে। প্রথমত. রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝাপটার ব্যাপারটা তো আছেই। দ্বিতীয়ত. আছে লাঠি হিসেবে ছাতার ব্যবহার। তুই কোথাও যাচ্ছিস পথে হঠাৎ কারো দ্বারা আক্রান্ত হলি তা সে মানুষ বা হিংস্র পশু যেই হোক না কেন, সঙ্গের ছাতাটিই তখন তোর আত্মরক্ষার কাজও করে থাকে। তৃতীয়ত. অনেক পর্দানশিন মহিলা বোরখার বিকল্প হিসেবে ছাতা ব্যবহার করে থাকে। গ্রামগঞ্জে অনেক জায়গায় দেখা যায়, মহিলারা রাস্তায় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে চলার জন্য হাতের ছাতাটা এই দিকে একটু কাত করে ধরে পথ চলছেন।

চতুর্থত. ছাতা একটা হাতের শোভা বা মর্যাদার প্রতীকও বটে। আগেকার দিনের জমিদার-জোতদার প্রভুরা ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবি, চটি জুতার সঙ্গে হাতে একটা বেতের বাকা বাটওয়ালা ছাতাও রাখতেন। এতে করে তাদের অভিজাত্যটা আরো দ্বিগুণভাবে ফুটে উঠতো। এছাড়াও ছাতার আরো অনেক ব্যবহার আছে। যেমন নিজের ফেভারিট টিম খেলায় জিতলে মাঠে নেমে বিজয় উল্লাসে হাতের ছাতা উপরে ছুড়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা যায়। অপরিচ্ছন্ন সিটে বসতে হলে নিজের হাতের ছাতাটা দিয়ে সেই সিটটা পরিষ্কার করে নেয়া হয়। সর্দি লাগলে রুমালের অভাবে অনেক বেরসিক ব্যক্তি ছাতার কাপড় নিয়ে নাক মুছে থাকেন। এটা অবশ্য একটা বাজে অভ্যাস।

যাহোক, এতো কিছু বুঝিয়েও ছাতার প্রতি শিলুফার বিরূপ মনোভাবের এতোটুকুও পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হলাম। ছাতা ও ছাতা ব্যবহারকারীর প্রতি তার নাক সিটকানো ভাবটা আগের মতোই রয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছি। হাফ স্কুল। তাই বেলা দুটোর দিকেই ছুটি হয়ে গিয়েছে। আমি আগে আর শিলুফা আমার পেছনে পেছনে হেটে আসছে। হঠাৎ মাঝ রাস্তায় এসে শিলু বললো, আমার পায়খানা চেপেছে রে। আমি পায়খানায় যাবো।

আশ্চর্য হয়ে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললাম, বলছিস কি তুই! এখানে কিভাবে সম্ভব? এই ফাকা রাস্তায়...। তাছাড়া তুই মেয়ে, একেবারে জাত যাবে, বুঝলি।
না, না, তুই বুঝছিস না। সত্যি আমার দারুণ অবস্থা।
তার দিকে তাকিয়ে কেমন একটা অসহায়ত্ব লক্ষ্য করলাম তার চোখে-মুখে। বললাম, কোনো রকমে ঠেকিয়ে রাখতে পারিস কি না দেখ। বাড়ি গিয়েই এ কাজটা সেরে ফেলিস।
না, না, সম্ভব না। তুই তাড়াতাড়ি একটা পথ বাৎলে দে ভাই। আমি আর পারছি না।
দারুণ উদ্বেগের ভাব তার চোখে। আমি এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখি সামনে পেছনে লোকজন নেই। তাড়াতাড়ি হাতের ছাতাটা মেলে তার হাতে দিই। তারপর রাস্তার পাশের ছোট ডোবাটা দেখিয়ে বলি ছাতা দিয়ে ভালো করে আড়াল করে বসে ওইখান থেকে কাজটা সেরে আয়। ততোক্ষণে আমি একটু সামনে গিয়ে অপেক্ষা করি।
মিনিট দশেক পর শিলুফা কাজ সেরে এসে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে, ভাগ্যিস তোর ছাতাটা ছিল। না হলে কি অপ্রস্তুতই না হতাম আজ।
মুচকি হেসে বললাম, তাহলে এতোদিনে বিষয়টা বুঝলি।
এদিন থেকে ছাতা বা ছাতাওয়ালাদের সম্পর্কে তার খারাপ ধারণাটা শিলুফা বাদ দিয়েছিল।

জগতপুর, রাজবাড়ী থেকে

ক্ষমতা

– মির্জা ফারহানা ইয়াসমিন ডানা

আমার একটা নীতি আছে। রোদে পুড়বো তবুও ছাতা নেবো না। আমার কাজিন টুম্পা ঠিক এর উল্টো। ছাতা সঙ্গে থাকবেই। তবে ছাতা হারানোর একটা বাতিক তার আছে। একটা ছাতা বড়জোর পাচ ছয় মাস তার চলে। তবে শেষ ছাতাটা আজো টিকে আছে। সেই ঘটনাই লিখছি।
তার শেষ ছাতাটা কিনে খালা কড়া গলায় বলে দিয়েছেন, এটা হারালে সে আর ছাতা পাবে না।
টুম্পা বেশ চিন্তিত। সব সময় সাবধান থাকে। তাকে চিন্তামুক্ত করার জন্য একটা উপায় বাতলে দিলাম যদিও সে প্রথমে রাজি হয়নি। ছাতার ভেতর তার নাম, ঠিকানা সব লিখে দিলাম। আরো লিখে দিলাম, এই ছাতাটা যে পাবে সে যেন এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।
যথারীতি টুম্পা ছাতা হারালো। এবং ভীষণ অবাক কাণ্ড যে, ছাতা হারানোর ঠিক দুই সপ্তাহের মাথায় কুরিয়ারে ছাতা ফেরত এলো। টুম্পা তো মহাখুশি। সে ধন্যবাদ স্বরূপ সেই দয়ালু ব্যক্তি আসিফকে চিঠি পাঠালো।
এরপর প্রায় এক মাস তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। হঠাৎ একদিন টুম্পা কলেজে উপস্থিত। সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তি। জানলাম এই সেই আসিফ। আরো জানলাম এই মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিচয়, দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রেম, তৃতীয় সপ্তাহে চুটিয়ে ঘোরা এবং চতুর্থ সপ্তাহে বিয়ের সিদ্ধান্ত। ছাতায় নাম লিখে আমি খুব উপকার করেছি। এখন যদি খালাকে তাদের কথা বলি তাহলে আরো উপকার হয়।
এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। গার্ডিয়ানদের মতে টুম্পা-আসিফ বিয়ে করলো আর আমি সুন্দর সুন্দর ছাতা কিনে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু করলাম।

চা বাগান, গাজীপুর থেকে

তথ্য বিচিত্রা

– লিপি

ছাতা আমাদের নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলোর একটি। এই হিসেবে ছাতা আমাদের বন্ধুও বটে। ইজিপ্টে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন রাস্তা দিয়ে হেটে যেতো তখন ক্রীতদাসরা তাদের মাথায় ছাতা ধরে রাখতো। অবশ্য আমাদের দেশে গ্রামে মাতব্বর বা চেয়ারম্যান শ্রেণীর লোকের মাথায় চামচাদের ছাতা ধরে রাখার দৃশ্যটা বহু পুরনো। একবার বাণিজ্য মেলা চলাকালে দৈনিক পত্রিকায় দেখেছিলাম মেলায় আসা তরুণীদের মাথায় এক অদ্ভুত ছাতা যে ছাতা আকারে খুব ছোট এবং তা মাথার সঙ্গেই লাগানো।

ছাতা কে আবিষ্কার করেছে সে সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিন হাজার বছরের পুরনো চায়না দেশের এক উপকথায় ছাতার আবিষ্কার সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপকথার এক জায়গায় ছুতোর লু প্যান তার গিন্নিকে বড়াই করে বলতে শোনা যায়, আমি এমন একটা ছাদ বানিয়েছি যেটাকে ইচ্ছে করলে সবাই সবখনে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

আমাদের উপকারী বন্ধু ছাতা সম্পর্কে নিচের তথ্যগুলো পড়ে বেশ অবাকই হবেন। চলুন জানা যাক ছাতা সম্পর্কে হরেক রকম তথ্য।

এক. ছাতার ইংরেজি হচ্ছে *আমব্রেলা।* ইটালিয়ান শব্দ *অমব্রেল্লো* থেকে আমব্রেলা শব্দটি এসেছে। ইটালিয়ানরা আবার এ শব্দটি ধার করেছে ল্যাটিন থেকে। ল্যাটিন ভাষায় *আমব্রা* কথাটির অর্থ *ছায়া।*

দুই. ইংল্যান্ডে প্রথম ছাতা ব্যবহারকারীর নাম জোনাস হ্যানওয়ে। কিন্তু হ্যানওয়ের ছাতা ব্যবহারকে ইংল্যান্ডবাসীরা ভালোভাবে নেয়নি। এমনকি তারা হ্যানওয়ের ছাতা ব্যবহার নিয়ে হাসাহাসি করতো, পাথর ছুড়ে মারতো। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। এক সময় ইংল্যান্ডেবাসীরা নানানভাবে ছাতার উপকারিতা বুঝতে পারলো। এবং নিজেরাও ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো।

তিন. এক সময় ইংল্যান্ডে ছাতার বাটের দিকে লম্বা একটা শিকল লাগান থাকতো এবং সেই শিকলের অপর প্রান্তে থাকতো ছোট একটা লোহার বল। পথিক যখন ছাতা মাথায় পথে বের হতো তখন এই বলটা মাটি দিয়ে গড়াতে গড়াতে যেতো তার পাশে। ছাতাকে বজ্রপাত বিরোধী দণ্ডে পরিণত করতেই নাকি ছিল এ ব্যবস্থা।

চার. ইংল্যান্ডে ছাতার কদর থাকলেও ইটালির জিগনেসি গ্রামের বাসিন্দারা ছাতার প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রারম্ভে যখন সারা বিশ্ব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তখন জিগনেসি গ্রামের বাসিন্দারা তাদের শখের ছাতার জাদুঘরে পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে ছাতা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ১৯৩৮ সালে এই ছাতা জাদুঘরের এক সংগঠক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার বহুল আলোচিত ছাতাটি চেয়ে বসেন।

পাচ. প্রাচীন আমলের চায়নিজ সম্রাটরা চার ছাউনিওয়ালা ছাতা ব্যবহার করতেন। তবে সহজ ব্যাপার হলো ছাউনিগুলো উপরের দিক ক্রমেই ছোট আকারের হতো। ফলে সে ছাতা দেখতে ছিল অনেকটা প্যাগোডার মতো। ধীরে ধীরে ছাতার এই ছাউনি সংখ্যা হয়ে যায় চায়না, কম্বোডিয়া এলাকার রাজাদের মর্যাদা জাহির করার একটা মাধ্যম। পাচ ছাউনিওয়ালা ছাতাধারী রাজার

মানমর্যাদা ছিল চার ছাউনিওয়ালা ছাতাধারী রাজাদের চেয়ে বেশি। সেকালে শ্যাম দেশের (থাইল্যান্ড) রাজা যে ছাতাটি মাথায় দিতেন সেটার ছাউনি সংখ্যা ছিল সাত।

ছয়. ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই খুব শৌখিন ছিলেন ছাতার ব্যাপারে। রেশমি কাপড়ের তৈরি এগারোটি রঙের ছাতা ছিল তার। ছাতাগুলোর মধ্যে সোনার এবং রূপার ঝালর দেয়া তিনটি ছাতা ছিল। বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে রাজা এগুলো মাথায় দিয়ে যেতেন। ফ্রান্সের রাজার মতো প্রজারাও ধীরে ধীরে ছাতার ব্যাপারে শৌখিন হতে শুরু করে। কিন্তু ছাতার দাম অনেক বেশি হওয়ায় তা সবার কেনার মধ্যে ছিল না। ফলে ছাতা ভাড়া দেয়ার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। প্যারিসের একটি প্রতিষ্ঠান ছাতা ভাড়া দিয়ে বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়।

সাত. ওয়াটারলু-তে যুদ্ধে যাবার সময় বৃষ্টি থেকে বাচতে বৃটিশ সেনা অফিসাররা প্রত্যেকেই মাথায় ছাতা ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ছাতা ফেলে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল।

আট. প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে রাজা-রানী, রাজপুত্র বা রাজকন্যাদের কেউ মারা গেলে তাদের মৃতদেহ সৎকারের সময় একটা করে ছাতাও দিয়ে দেয়া হতো। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান দেবতা বিষ্ণুর মাথার ওপর ছাতা থাকার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে।

নয়. ছাতা ব্যাপারটির সঙ্গে কম বেশি কুসংস্কার জড়িয়ে আছে। যেমন কারো হাত থেকে ছাতা পড়ে যাওয়া মানে অমঙ্গল বা বিপদ ডেকে আনা। অনেকেই বিছানার ওপর ছাতা রাখেন না কিংবা মাটিতে বিছিয়ে তার ওপর বসেন না। অমঙ্গলের ভয়ে ঘরে ছাতা মেলেন না অনেকে। জ্যোৎস্না রাতে কেউ যদি ভুল করে মাথায় ছাতা দেয় তাহলে নির্ঘাত বৃষ্টি হবে এ রকম ধারণাও আছে অনেকের মধ্যে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইসরেলের এক দৈনিক পত্রিকায়। পরে সেটা পুনঃমুদ্রিত হয় আমেরিকার আরেকটি পত্রিকায়। সেই লেখার আংশিক অনুবাদ এই লেখা।

পাংশা, রাজবাড়ি থেকে

অপারগ

– মানিত্তা বাল হুদা

আমার বান্ধবী পিংকি। সর্বদা আলট্রা মর্ডান থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে অন্য বান্ধবীদের বিরক্ত করে, হাসায়, মন ভালো করে দেয়। সে মদন বা মফিজ ক্যাটাগরির ছেলেদের দেখলেই নাক সিটকায়। পোশাক, সাজ-সজ্জা ও কথা-বার্তায় কেউ পারফেক্ট না হলে পিংকি তার সঙ্গে কোথাও যায় না। তবে মনের দিক থেকে খুব ভালো মেয়ে পিংকি। কবিতা লেখার হাতও খুব ভালো তার। কবিতা লিখতে গিয়ে তার মনে রঙ সৃষ্টি হয় যাকে সোজা বাংলায় বলা চলে *প্রেমের রঙ।* অর্থাৎ তার মন এক সময় প্রেম পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

একদিন এক সুদর্শন তরুণ পিংকিকে প্রণয়ের প্রস্তাব দেয়। পিংকি তো তখন খুশিতে আটখানা। ছেলেটি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট-এ অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। আর পিংকি ইংরেজি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। তবে প্রণয়ের প্রস্তাব পিংকির কাছে এসেছে আমাদের এক বান্ধবী পান্নার মাধ্যমে।

পান্নাকে পিংকি জানালো, আমার প্রেমিক পুরুষকে আগামীকাল বিকাল পাচটায় বারী প্লাজার আসতে বলবি।
পিংকির এই রোমান্টিক মেসেজ নিয়ে প্রেমিক পুরুষের কানে দেয়ার জন্য পান্না দৌড়ায়।
পিংকি পরদিন বিকাল সাড়ে চারটায় রেটিনাকে নিয়ে আমাদের বাসায় এসে আমাকে দ্রুত রেডি হতে বলে। রেডি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে আগের দিনের ঘটনার বর্ণনা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ শাড়ি ও ম্যাচিং করে অন্যান্য সব পরে নিলাম। আমরা তিন বান্ধবী তখন তিন ক্যাটেগরির সাজে সজ্জিত। বোরখা পরিহিতা রেটিনা, থৃ পিসের সঙ্গে হাই হিল পরিধান করা পিংকি এবং শাড়ি পরা আমি। বাসার গেট থেকে যেই ধেই ধেই করে বের হতে গেলাম অমনি আকাশ মেঘের আভায় অন্ধকার হয়ে গেল।
আমরা ছাতা নিয়ে বের হইনি। তাই রিকশা একটির বদলে দুটি নিলাম। রেটিনা এক রিকশায় এবং অন্যটিতে আমি ও পিংকি বসলাম। পাক্কা ১৫ মিনিট পর রিকশা দুটি গিয়ে থামলো বারী প্লাজার রাস্তায়। পথে মুষলধারে বৃষ্টি হলেও রিকশাচালকের পর্দা আমাদের ভেজার হাত থেকে রক্ষা করেছে। বারী প্লাজায় কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকার পর পিংকির প্রেমিক এসে উপস্থিত হলো। পোশাক–আশাক ভালোই পরেছে। কিন্তু হাতে করে যে ছাতাটি নিয়ে এলো সে ছাতাটির রঙ জ্বলে অসুন্দর দেখা যাচ্ছে। এতেই পিংকি সিদ্ধান্ত নেয়, যে ছেলে অমন বিশ্রী ছাতা নিয়ে প্রথম সাক্ষাতে উপস্থিত হয় তার সঙ্গে আর যাই হোক প্রেম করা যাবে না। তাই যুবকের সঙ্গে কথা না বলে পিংকি আমাদের বললো, চল, বাসায় যাওয়া যাক।
পরে পান্নার মাধ্যমে প্রেমিক পুরুষকে তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেয় পিংকি।

ময়মনসিংহ থেকে

গর্ভধারিণী

– মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

১৯৬৮ সালের কথা। এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। রেজাল্ট বের হতে দেরি আছে। লেখাপড়ার তাগিদ নেই। কোনো কিছুতেই ব্যস্ততা নেই। দিন–রাত অখণ্ড অবসর। তখন জীবন মানে অলস দিন যাপনের বিরস কাব্য।
জুলাই মাসের ৬ তারিখ। বারটা ঠিক মনে নেই। মাঝ রাত থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আষাঢ়ের প্রবল বৃষ্টি। থামার কোনো লক্ষণ নেই। বৃষ্টির বেগ মাঝে মধ্যে বাড়া–কমা করছে। আবার একটু শীতও লাগছে। কাথা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে পড়ে আছি। টিনের চালে অবিরাম বৃষ্টিপতনের শব্দ। কান পেতে সেই শব্দ শুনছি। এ যেন শব্দ নয়, এ এক সঙ্গীত। বৃষ্টিমুখর মধ্য রাতে সেই সঙ্গীত সুধা একাকী পান করছি আর মনের মধ্যে স্বপ্নের জাল বুনছি। জীবনের এক অন্য রকম মুহূর্ত যখন সব কিছু সুন্দর, মধুময় লাগে।
মাঝে মাঝে বৃষ্টি ধরে আসছে। কাথার অন্তরাল থেকে মুখ বের করছি, ভোর হলো কি না দেখছি। বৃষ্টির বেগ বাড়তেই আবার কাথার অন্তরালে আত্মগোপন করছি। আমার নির্ঘুম চোখে একটি সুন্দর সকালের প্রতীক্ষা।

ভোর হওয়ার আগেই বৃষ্টি কিছুটা ধরে এলো। দুই একটি পাখির কিচির–মিচির ডাক শুনতে পাচ্ছি। একটা ভেজা কাক কর্কশ স্বরে ডাকছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দক্ষিণের জানালা দিয়ে আকাশ দেখছি। জলভরা মেঘ দেখছি এবং প্রতি মুহূর্তে পুনর্বার বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা করছি।

বিছানা ছেড়ে উঠলাম। ঘরের ভেতরে একটু হাটাহাটি করলাম। জানালার পাশে গিয়ে দাড়ালাম। দেখি আমাদের পুব মাঠের ধানক্ষেত বর্ষার পানিতে ডুবে একাকার হয়ে গেছে। সবুজ ধানক্ষেতের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু দুই এক জায়গায় ডুবন্ত ধানের চারাগুলো পানির ভেতর থেকে উকি–ঝুকি দিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে চারাগুলোর ডুবে যাওয়া এবং ভেসে ওঠার দৃশ্য দেখলাম।

কিছুদিন যাবৎ মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। ১১জন সন্তানের জন্ম দিয়েছেন আমার মা। এবার ১২তম সন্তানের জননী হবেন। অনেক দিন ধরে তিনি অপুষ্টি এবং রক্তশূন্যতায় ভুগছেন। এই সন্তানটি পেটে আসার পর থেকে মায়ের শরীর দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমি দেখি, মা ধীর পায়ে হাটেন, আস্তে কথা বলেন। ভারী শরীরটাকে কোনো রকমে টেনে–টুনে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করেন। আমার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করায় মা খুব কষ্টে আছেন, সময়ে অসময়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন এবং গোপনে অশ্রুপাত করেন। গ্রামের একজন হাতুড়ে ডাক্তার তার চিসিৎসা করেন। মায়ের শরীর সম্পর্কে প্রায়ই পরামর্শ দেন। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ না শুনে, পথ্য না খেয়ে, জীবনের প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে, শেষ সন্তানটিকে পেটে ধরে, তিলে তিলে আমার গর্ভধারিণী মা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগোতে থাকেন।

সকালের দিকে কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার বৃষ্টি শুরু হলো। ইতিমধ্যে মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। মা আমার ছোটভাইকে ফুপুর কাছে পাঠিয়েছেন। আমার হতদরিদ্র ফুপুর কোনো ছাতা নেই। সে একটি বড় মানকচুর পাতা মাথায় দিয়ে আধা ভেজা হয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। পাশের বাড়ি থেকে ভিজে আমার মেজচাচি এলেন। তারা সবাই মায়ের ঘরে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি এ ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছি মা কাতরাচ্ছেন। বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে হৃদয় উপকূলে বার বার আছড়ে পড়ছে।

মাকে নিয়ে ফুপুরা কি করছে তা অনুমান করতে পারছি। আমার বুদ্ধি হবার পর থেকে একটি শিশুর কান্নার জন্য মাকে এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখিনি। তাই মনে মনেই দুঃসংবাদের আশঙ্কা করছি।

আস্তে আস্তে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বৃষ্টির শব্দে মায়ের কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পারছি না। ভাবছি মায়ের অবস্থা বোধহয় ভালোর দিকে। যার আসার কথা সে হয়তো প্রচণ্ড চিৎকারে তার আগমন বার্তা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা যে কতো ভুল তা কিছুক্ষণের মধ্যে টের পেলাম।

ফুপু এসে আমাকে বললেন, তোর মায়ের অবস্থা খুব খারাপ, শিগগিরই আবুল ডাক্তারকে নিয়ে আয়।

আমি তখন দিশেহারা। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। ঘরের মধ্যে গর্ভ যন্ত্রণায় নীলবর্ণ হওয়া আমার মায়ের মুখ। এই মুহূর্তে একটা ছাতার বড় প্রয়োজন। আমাদের মতো পরিবারে তখন একটার বেশি ছাতা থাকে না। আমাদের যে ছাতাটি ছিল সেটি আমার বাবা নিয়ে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাপের বাড়িতে গেছেন। দৌড়ে চাচার বাড়িতে গেলাম। এ বাড়ি, সে বাড়ি সব বাড়িতে খুজলাম, কোনো বাড়িতেই ছাতা পেলাম না। সবাই কোনো না কোনো কাজে বাইরে গেছে। অগত্যা সেই আষাঢ়ের প্রর্বল বর্ষণ মাথায় করে ডাক্তারের কাছে গেলাম। মাথার ওপরে আষাঢ়ের প্রচণ্ড মেঘ, পায়ের নিচে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ সবই আমার কাছে তখন তুচ্ছ।

সম্পূর্ণ কাকভেজা হয়ে ডাক্তারের কাছে গেছি। আমার সব কথা শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি আসছি। আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরছি। আর এতোক্ষণ মা বেচে আছে কি না এটাই মনে মনে ভাবছি। যতোই বাড়ির কাছে যাচ্ছি ততোই আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ির কাছে আসতেই দেখি আমার পাড়া প্রতিবেশীরা ভিজে ভিজে আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। আমি উঠানে পা রেখে দেখি, আমার ছোট ভাইবোনেরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে বুকফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে। তখন বুঝতে বাকি রইলো না যে, আমার মা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেছেন। একটি মৃত সন্তান প্রসবের ধকল মায়ের দুর্বল শরীর সইতে পারেনি।

এরপর কতোদিন চলে গেছে। আমার সেই ফুপু এবং চাচি কেউ-ই এখন জীবিত নেই। নিজে এখন কতো রকমের দামি ছাতা ব্যবহার করি। ছেলেমেয়েদের বেছে বেছে সুন্দর ছাতা কিনে দিই। কিন্তু আমার মায়ের মৃত্যুদিনে ছাতা না পাওয়ার কষ্টটা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

রাজবাড়ী থেকে

কুলক্ষণা

– বিমলেন্দু সেন টিটু

ছাতা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে অথবা প্রখর রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটি মোক্ষম হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়। বিপদের বন্ধু এই ছাতাকে নিয়ে আছে নানান কুসংস্কার। আমার এক দাদু থাকেন শ্রীমঙ্গলে। ওনার মূল বাড়ি হলো হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানায়। তিনি আবার বিভিন্ন কুসংস্কারকে খুবই প্রশ্রয় দেন। যদিও তিনি শ্রীমঙ্গল থাকেন তবুও বাড়ির সঙ্গে ওনার যোগাযোগ ছিল সর্বদা। তিনি যখন বাড়ি যেতেন তখন সময় ও দূরত্ব এড়ানোর জন্য ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ব্যবহার না করে একটি বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতেন। এর সেই বিকল্প রাস্তায় একটি বাজারের নাম ছিল *ছাতিয়াইন বাজার।* এবং এ ছাতিয়াইন বাজার নিয়েই ছিল ওনার যতো আপত্তি।

আমরা যখন ওনার সঙ্গে যেতাম তখন হয়তো কেউ জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলতো, এখন ছাতিয়াইন বাজার অতিক্রম করছি। তিনি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলতেন এই নামটি গাড়িতে বসে উচ্চারণ না করার জন্য। কারণ ওনার ধারণা *ছাতা* শব্দটি হলো কুলক্ষণা বা অমঙ্গলজনক একটি শব্দ এবং ছাতিয়াইন যেহেতু ছাতা শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেহেতু এই *ছাতিয়াইন* শব্দটির দ্বারা যে কোনো সময় অমঙ্গলজনক ঘটনা হতে পারে। এই শব্দটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিতেন।

দাদুর কথায় হয়তো আমাদেরও ধারণা হতো ছাতা শব্দটি কুলক্ষণা। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় ছাতা যদিও কুলক্ষণা হয় তবুও কোনো শুভকাজে যদি হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি বাধা হয়ে দাড়ায় তাহলে তো ছাতাই একমাত্র ভরসা। এর তো কোনো বিকল্প নেই। তাই বিপদের বন্ধু এই ছাতাকে *কুলক্ষণা* বলাটা কতোটুকু যুক্তিসঙ্গত তা ভাবার অবকাশ থেকে যায়।

শ্রীমঙ্গল থেকে

নিঃসঙ্গতা

– মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির

রঙ বেরঙের ছাতার নিচে বসে বর্ষার ছল ছল ধারা আর স্মৃতি রোমন্থন করাটাই উপভোগ্য। তখন ঢাকা কলেজে পড়তাম। ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলাম। ঘোরাফেরাটা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। বাসায় বসে থাকতে পারি না। তাই অলিগলি পার হয়ে বাস স্টেশন এসে যখন হাটছিলাম তখনই প্রকৃতি তার রিমঝিম সুরে কাদতে লাগলো।

ছোট শহরটিতে অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ ছিল। এমন মেঘলা আর বর্ষার দিনে প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর মজাটাই আলাদা। আমার কাছে কোনো ছাতা ছিল না। বাধ্য হয়ে একটা দোকানের ঝাপের নিচে দাড়াতে হলো। সঙ্গী হলো দুটি শাদা–কালো কুকুর ও একটা ছাগল ছানা। তারাও আমার মতো বৃষ্টির নবধারাকে উপভোগ করছে। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দে দোকানের টিনগুলো যেন ছন্দে ছন্দে নাচতে লাগলো। নিজের ওপর ভীষণ জিদ হলো। কেন যে ছাতাটা আনলাম না! আনমনে লম্বা ও প্রশস্ত রাস্তাটির দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির খেলাকে উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে একটা অজানা স্বর ভেসে উঠলো। কে যেন বললো, আসবেন নাকি।

মুখটাকে পেছনে ঘুরিয়ে চমকে গেলাম। একটা অচেনা অজানা মেয়ে এভাবে একটা ছেলেকে ছাতার নিচে আসতে বললো। হয়তো বিবেকের তাড়নায় মেয়েটি কাজটি করেছে।

শঙ্কিত গলায় বললাম, আসবো।

মেয়েটি কথা বললো না। উপায়ান্তর না দেখে মেয়েটির ছাতার নিচে চলে গেলাম। ছাতাটা রঙ বেরঙের ছিল। বৃষ্টির মাত্রাও কিছুটা বাড়ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কিসে পড়ো।

মেয়েটির সরল উত্তর, কলেজে পড়ি সেকেন্ড ইয়ারে।

আমিও সেকেন্ড ইয়ারে। তবে তোমাদের কলেজে নয়, ঢাকায়, ঢাকা কলেজে।

বৃষ্টিতে আমাদের কাপড় প্রায় ভিজেই গেছে। একই ছাতার নিচে তার শরীরের সঙ্গে আমার শরীরটা লেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তবুও ১৭ কি ১৮ বছরের একটা মেয়ের শরীরের মায়াবী স্পর্শে যতোটা না আকৃষ্ট হয়েছি তার চেয়ে তার অন্তরের অন্তস্থলের মর্মস্পর্শী হৃদয়টাতে আকৃষ্ট হয়ে গেছি। অচেনা অনুভূতি আমাকে আলোড়িত করতে লাগলো।

তার সঙ্গে বন্ধুত্বের লোভ সামলাতে না পেরে তাকে বিনীত গলায় বললাম, আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে?

সে কিছুটা মুচকি হাসি দিয়ে বললো, করতে পারি।

আমি আকাশ, তুমি?

আমি ছন্দা।

একটু পরেই ছন্দার চেনা হাসিটা বিলীন হয়ে গেল। ছন্দা অনেকটা আক্ষেপ করে বললো, জানো, আমার না একটা ছাতা বন্ধু ছিল।

খুব মনোযোগ সহকারে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। বললাম, আমার সঙ্গে পরিচয় করে দেবে?

বললো, দুঃখিত তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছো?

হ্যা, হারিয়ে ফেলেছি। ছন্দা বিমর্ষ কণ্ঠে বলতে লাগলো, আমার বয়স যখন ৯ কি ১০ বছর তখন ঠিক তোমার মতো আমার ছাতা বন্ধুটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সেদিন আমাকে সে ভিজতে দেখেছিল। আমার কাছে কোনো ছাতা ছিল না। আমাকে দেখে সে দাড়িয়ে গেল। আমিও ছাতার প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে গেলাম। আমি বললাম, আসবো। ছাতা বন্ধুটা হাসি মুখে আমাকে ছাতার নিচে নিয়ে নিল। দুইজন জড়াজড়ি করে হাটতে লাগলাম। ছাতাটা ছিল ছোট। সেই থেকে আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

এভাবে একটি বছর এক সঙ্গে চলাফেরা, খেলাধুলা করেছি। এই ছোট্ট শহরে বন্ধু থাকলে শুধু সেই ছিল। আমার ছাতা বন্ধুটি আমার জন্মদিনে আমাকে একটা ছাতা উপহার দিয়েছিল। কারণ আমাদের পরিচয় ছাতা দিয়ে। আমার পাগল বন্ধু। আমি কখন যে তার সঙ্গে গভীর হয়ে গিয়েছিলাম তা নিজেই জানতাম না। অথচ এমন বয়সে প্রেম ভালোবাসা বলে কিছু আছে নাকি বোধগম্য ছিল না।

একদিন খেলার মাঠে তার জন্য অপেক্ষা করি। প্রায় দুই ঘণ্টার মতো বসেছিলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন আমার ছাতা বন্ধুটি মাঠে আসেনি। বিষণ্ন মনে বাসায় চলে গেলাম। পরদিন তাদের বাসায় খোজ নিয়ে জানলাম তারা নাকি বাসা বদল করে চলে গেছে। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা অশ্রু বিসর্জন দিতে হলো। সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, আজ কলেজ পর্যায়ে এসেও আমার সেই ছাতা বন্ধুটিকে মনে মনে খুজি। তাকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছা করে। যখনই বুঝেছি প্রেম ভালোবাসা বলে কিছু আছে তখনই শুধু ছাতা বন্ধুটির অভাব অনুভব করেছি। আজো জানি না সে কোথায় আছে।

ছন্দা নিশ্চুপ হয়ে গেল। বললাম, তাকে যদি তুমি এখনো পাও তাহলে কি তাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করবে?

ছন্দা বললো, নিয়তির নির্মম পরিহাস। আমি এখন এক বাধনে বাধা। আমার বিয়ের এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। দুমাস পরেই স্বামীর বাড়িতে আমার ঠাই হবে।

ছন্দা কথাটা শেষ করা মাত্রই এক আচমকা যন্ত্রণা আমার হৃদয়ে হানা দিল। আমি আকাশই যে তার সেই ছোট্টবেলার সঙ্গী ছিলাম তা ছন্দা চিনতে পারেনি। আমিও তাকে চিনতে পারিনি। ছন্দা আমারই কাহিনী আমাকে শোনাচ্ছে। দুর্ভাগ্য, সে-ই তার গল্পে তার সিদ্ধান্তটা বলে দিয়েছে। এক বাধনে বাধা হয়ে গেছে। সেদিন আমরা গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। আমি গিয়েছিলাম ঢাকায়। সেখানেই কয়েকটা বছর অতিক্রম করেছি। আমিও তাকে খুজেছিলাম। পাইনি। তারাও অন্যত্র চলে গিয়েছিল। আমি যার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম সেই আজ নিয়তির আবর্তে হারিয়ে গেল। বৃষ্টির রিমঝিম ধারা কিছুটা কমলো। আমরা প্রায় দুই কিলোমিটার পার হয়ে গেলাম।

ছন্দা বললো, আমরা কলেজে এসে পড়েছি। তুমি কি আমার সঙ্গে আসবে?

বললাম, আজ নয়, অন্যদিন।

যতোদূর দৃষ্টি ছিল ততোদূর ছন্দার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েও আমার ছাতা বন্ধু ছন্দার কথা ভুলতে পারিনি। আজও তার প্রতীক্ষায় আছি। আজও বৃষ্টি ভেজা প্রহর আর ছাতা আমাকে কাদায়। আমার ছন্দার কথা মনে করে দেয়।

ধন্যবাদ ছাতা, ধন্যবাদ খোদার প্রকৃতির বৃষ্টি। হয়তো আমার জীবনে ছন্দার আগমন নয়, আবির্ভাব। এই আবির্ভাবকে ছাতার নিচে ভালোবাসার পিঞ্জরে সযত্নে লালন-পালন করবো যদিও কিছুটা নিঃসঙ্গতা।

সিলেট থেকে

বিসর্জন

– ঝর্না

১৯৬০ সালের প্রথম দিকের কথা। আমার বাবা আমাকে ঢাকা সদরঘাট থেকে ছোট একটা ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। ছাতাটা দেখতে সুন্দর এবং হালকা ছিল। আমি তখন শিবচর থানার ভদ্রাসন স্কুলে ক্লাস ওয়ান–এ পড়ি। আমার বড় তিন ভাইও এ স্কুলেই পড়ালেখা করতেন। বাবা আমাকে ছাতা দেয়াতে ভাইয়েরা খুবই মন খারাপ করলো।

এর মধ্যে ছোটদা আমার সঙ্গে আপোস করলেন, তিনি যেদিন আমাকে চানাচুর খাওয়াবেন সেদিন ছাতা স্কুলে নিয়ে যাবেন। এ ছাতা নিয়ে আমাদের দুই ভাই–বোনের দিন ভালোই চলছিল। স্কুলে ছাতার জন্য আমার সহপাঠীরা কদর করতো। রোদ বৃষ্টিতে যেন ছাতার নিচে তাদের নিই। এজন্য বাড়ি থেকে নাড়ু মুড়ি এনে খাওয়াতো।

একদিন বৃষ্টিতে ভিজে ন–দার জ্বর হলো। দুই দিন পর সেরেও গেল। কিন্তু বিগড়ে গেল মাথা। তিনি আর রোদ বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যাবেন না। ছাতা তিনি নেবেনই। তার এক কথা। ন–দা একটু গোয়ার ধরনের ছেলে। কান্নাকাটি করে লাভ হলো না। সুতরাং অন্য পথ ধরতে হবে। ভেবে চিন্তে বের করলাম ছাতা গায়েব করে দিতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। সন্ধ্যার আলো আধারিতে বাড়ির পানা পুকুরে বিসর্জন দিলাম ছাতা। প্রথমে জেরা, পরে কিল থাপ্পড়ে স্বীকার করিনি অপকর্মের কথা।

বয়স ৪০ পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। আজও ছাতা কিনিনি। ছেলের বাবা ছেলেকে ছাতা কিনে দিয়েছে, আমি দিইনি। আমি ভুলিনি আমার বাবার কিনে দেয়া সেই ছোট ছাতাটির কথা। বাবার আদর জড়ানো সেই ছোট ছাতাটিই যেন আজও আমার ওপর আছে। চোখ বুজলে টের পাই বাবা আছেন আমার কাছে কাছেই।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

আড়াল

– মোমিনুল ইসলাম

নির্দিষ্ট সময় থেকে ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। এমন সময় *ন*–এর রিকশা পাবলিক লাইব্রেরির সামনে এসে দাড়ালো। সামনে এগিয়ে গিয়ে তার কাছে গিয়ে বললাম, চলো, ভেতরে না বসে আজ কোথাও বেড়িয়ে আসি।

সে বললো, ঠিক আছে। তবে কোথায় যাবে?

বললাম, চলো ভদ্রা পার্কে যাই, জায়গাটা নাকি বেশ আধুনিক। জায়গাটা কিছু দূরে হওয়ায় মৃদু আপত্তি করার পরেও সে যাওয়ার জন্য রাজি হলো।

রিকশা নিয়ে আমরা রওনা হলাম। পার্ক থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে রিকশা ছেড়ে পায়ে হাটা পথ দিয়ে পার্কে পৌছালাম। টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। দুপুর হয়ে গেছে। তাই হয়তো কিছুটা ফাকা ফাকা মনে হলো। আমরা দেখলাম কয়েকটা জুটি শুধু বসে আছে। আসলে এই পার্কটা এখন কপোত–কপোতির জন্য আদর্শ। আমরা নিরিবিলি একটা ইটের তৈরি বেঞ্চে গিয়ে বসলাম।

সুযোগ পেয়ে তার কাছে আবদার করলাম, তোমার কোলে মাথা রেখে আকাশ দেখি?

মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও সে রাজি হয়ে গেল। তার কোলে মাথা রেখে বেঞ্চে শুয়ে আকাশ দেখছি আর তার কথা শুনছি।

হঠাৎ সে বললো, দেখো, দেখো।

বললাম, কি দেখবো? ভাবলাম সে হয়তো আমাকে উঠাতে চাচ্ছে। তাই ফান করছে। এ জন্য না উঠে একইভাবে শুয়ে থাকলাম।

আবার বললো, দেখোই না।

উঠে দেখলাম, আমাদের থেকে সামান্য দূরত্বে এক জোড়া কপোত–কপোতি এই বৃষ্টিহীন দিনেও ছাতা মেলে আমাদেরকে আড়াল করে নিজেদের উষ্ণতা বিনিময় করছে।

দেখতে দেখতে সে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো। মজা করার জন্য বললাম, তারা কি করছে?

তাদের দিকে তাকিয়েই সে সহজ স্বরে বললো, কিস! কিস করছে।

বললাম, আইডিয়াটা তো দারুণ।

সে বললো হ্যা, দারুণ। আগামীতে আমরাও ছাতা নিয়ে আসবো।

রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। তাকে রাগিয়ে দেয়ার জন্য বললাম, তুমি কখনো অতোটা রোমান্টিক হতে পারবে না।

সে বললো, কেন পারবো না? অবশ্যই পারবো।

আমরা কিছুক্ষণ পর সেদিন ফিরে এলাম।

এর কিছুদিন পর আমাদের আবার দেখা হলো। সে বললো, চলো ভদ্রায় যাই।

এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলাম। পার্কে ঢোকার পর দেখলাম সে ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে আমার সামনে ধরলো। বললাম, এমন রোদে উজ্জ্বল দিনে ছাতা দিয়ে কি হবে?

সে বললো, দরকার আছে।

তৎক্ষণাৎ আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। এতোদিনে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। তার কথায় প্রমাদ গুণলাম। এরপর আমরা একটা গাছের নিচে গিয়ে বসলাম। দুজনে বাদাম চিবুতে চিবুতে গল্প করছি হঠাৎ সে ছাতা খুললো। তার মুখের দিকে তাকালাম। সে কিছু না বলে মাথা নিচু করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমণ্ডল লজ্জায় লাল হয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঘামছি। সাহস করে ছাতার বাটসহ তার হাতটা ধরলাম। সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলো। অনেকক্ষণ ঘোরের ভেতর কাটলো আমাদের। কারো মুখে কোনো কথা নেই। আস্তে আস্তে আমার ঠোটটা বাড়িয়ে দিলাম তার ঠোটের কাছে।

এরপর কতোক্ষণ গেছে জানি না। পাশ দিয়ে একজন ছেলে যেতে যেতে বললো, ছাতাটা পড়ে গেছে, তুলে নিন।

আমরা ছাতাটা তুলে সরে বসলাম।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

প্রত্যাখান

– লাকী রহমান

আমার কলিগ মনাআপার দেশপ্রেম প্রবল। তাকে নিজ দেশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সদা সচেষ্ট থাকতে দেখা যায়। যথারীতি এবারও থাকলেন। ছাতা আবিষ্কারের কথা উঠতেই বললেন, প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি কাজ আমাদের প্রধান পেশা। কৃষকেরা রোদ–বৃষ্টিতে *মাথাল* ব্যবহার করতো। এই মাথালের আধুনিক রূপ ছাতা। ছাতার ডিজাইনটা হয়তো মাথায় এসেছে ব্যাঙের ছাতা দেখে। কাজেই ছাতা আবিষ্কার আমরাই করেছি।

মনে মনে হাসি। মুখে বলি, হয়তো।

ছাতা নিয়ে ঘাটাঘাটি করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠলো। ছোটবেলা থেকে শুনেছি বিশ্বকোষে সব থাকে। এ আশাতেই *এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা* খুলে বসলাম। ছাতা সম্পর্কে কোনো তথ্যই পেলাম না। চাকা আবিষ্কারের মতো ছাতা আবিষ্কারের ইতিহাসও বোধহয় আবিষ্কৃত হয়নি। তবে জানতে পারলাম মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় মাথার ওপর ছাতার মতো ঝুটিওয়ালা এক রকম পাখি আছে। এ পাখির নাম আম্রবেলা বার্ড। আমব্রেলা টৃ সম্পর্কে জানলাম। এদের জলের প্রান্তে ছাতার মতো রিব আছে। আসল কথাটি জানা হলো না। আমব্রেলা থেকে আমব্রেলা বার্ড বা আমব্রেলা টৃ নামকরণ হয়েছে, নাকি উল্টোটা, ছাতার ইতিহাস নিয়ে আর এগোতে পারলাম না। ছাতার বর্তমানই ভরসা। সে বর্তমান নেহায়েত ব্যক্তিগত, খুব বেশি হলে পারিবারিক।

আমার এক চাচাশ্বশুর থাকেন আসামে। আমার দেখা একজন আদর্শ মানুষ। একাধিকবার এমএলএ নির্বাচিত হয়েও তিনি সহজ, সরল, সৎ এবং সাধারণ। সেই চাচাশ্বশুর একবার আকাশী রঙের একটি ব্যাগ এবং একটি আকাশী রঙের ছাতা দিয়েছিলেন। খুব সুন্দর। ভেবেছিলাম আকাশের রঙ যেদিন আকাশী থাকবে সেদিন এই ছাতা নিয়ে বাইরে যাবো। এবং ফিরে এসে সুন্দর করে গুছিয়ে একটি চিঠি লিখবো। আমার সে সাধ পূরণ হয়নি। আমার শ্বশুর কয়েকদিনের মাথায় সেটি কোথায় যেন ফেলে এলেন।

আমার বাবা দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান একজন মানুষ। স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা যদি হয় সকল সুখের মূল তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। সাধারণ ছাতায় তার একটু অসুবিধাই হতো। তিনি অর্ডার দিয়ে বড়সড়ো একটা ছাতা বানিয়ে নিয়েছিলেন। ডায়াবেটিসের কবলে পড়ে আমার বাবার সেই স্বাস্থ্য আর নেই। এখন তার সাধারণ ছাতাতেই চলে। বিশেষ ছাতাটি এখন স্টোর রুমে পড়ে আছে। আমার স্বামীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের বর্তমান ধারা যদি আরো কিছুদিন বজায় থাকে তাহলে ছাতাটির হিল্লে হতে পারে। ভাবছি বাবার বাড়ি বেড়াতে গেলে নিয়ে আসবো।

আমার স্বামী কয়েক বছর আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ানরা কাপড় শুকাতে দেয়ার জন্য এক ধরনের ছাতা ব্যবহার করে। মাটিতে স্থাপিত লোহার ছাতা। এ ছাতার শিকগুলো আছে কিন্তু কাপড় নেই। ছাতাটি আবার ঘোরানোও যায়। অল্প জায়গায় অনেক কাপড় শুকাতে দেয়ার চমৎকার ব্যবস্থা। এই চমৎকার ব্যবস্থাটি আমার শ্বশুরবাড়ির উঠানে আছে। বেশ কিছু টাকা খরচ করে বাড়িতে ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি এনে এটি বানানো হয়েছে। ছাতাটি পাড়ায় বেশ জনপ্রিয়।

ছোটবেলায় ষাটোর্ধ এক হুজুর কম করে হলেও পঞ্চাশোর্ধ একটি মলিন ছাতা নিয়ে আমাদের আরবি পড়াতে আসতেন এবং দশ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। একদিন ছাতা না নিয়ে এলেন। সেদিন

প্রথমবারের মতো তাকে ঘুমাতে দেখলাম না। ছাতাটি হারিয়ে ফেলেছেন বলতে গিয়ে তার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। দৃশ্যটি এখনো আমার চোখে ভেসে ওঠে।

তখন কলেজে পড়ি। এ সময় প্রায়ই টনসিলের ব্যথায় কষ্ট পেতাম। একদিন ডাক্তারের কাছে গিয়েছি, ফেরার সময় বৃষ্টিতে আটকা পরলাম। কোনো রিকশাও নেই। কি করবো ভাবছি এমন সময় দেখি ছাতা মাথায় শিহাবভাই। তখন অদ্ভুত সব জায়গায় তার সঙ্গে আমার দেখা হতো। শিহাবভাই বললেন, বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই, চলো এগিয়ে দিই।

এক ছাতার নিচে দুজন হাটছি। আমি যেন ভিজে না যাই সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এমন অবস্থায় কেউ কখনো ভালোবাসার কথা বলে? কিন্তু শিহাবভাই বললেন।

তার ছাতার নিচ থেকে বের হয়ে বৃষ্টির মধ্যে হাটতে শুরু করলাম। হয়তো খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। এরপর আর কখনো শিহাবভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। একটু ভদ্রভাবেও তো তাকে প্রত্যাখ্যান করা যেতো! ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার ছাতার নিচে চমৎকার কোনো মেয়ের ব্যবস্থা করবে। হয়তো ইতিমধ্যেই করেছে।

রাজশাহী থেকে

বাদল স্যার

– মোহাম্মদ হযরত আলী

কাকডাকা ভোরে হঠাৎ দুঃসংবাদটি শুনে বিছানা ছেড়ে বারান্দার জলচৌকিতে গিয়ে বসলাম। কে যেন মাইকিং করে বলছে, *একটি শোক সংবাদ। গতকাল রাত সাড়ে এগারোটার সময় হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র ইংরেজি শিক্ষক শহীদুল ইসলাম বাদল স্ট্রোকে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মরহুমের নামাজে জানাজা আজ বাদ জোহর স্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এক শোক সংবাদ।*

মুহূর্তে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। অশ্রু যেন বাধভাঙা বানের মতো ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কয়েক ফোটা নোনাজল চোখ থেকে গড়িয়ে গাল বেয়ে ঠোটের কিনার দিয়ে মুখে প্রবেশ করলো।

নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলাম না। হঠাৎ পেছন থেকে মা এসে পিঠে হাত রেখে কিছুটা আহত স্বরে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। এতে কান্নার কিছু নেই। মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে লাশের সৎকার করাই প্রধান কাজ। আজ তোর স্যার চলে গেলেন। কাল হয়তো আমি। তারপর আরেকজন। এভাবেই মানুষকে পৃথিবীর লেনদেন চুকিয়ে পরপারে চলে যেতে হয়। এবং মৃত্যুর পর কেউ কাদলে মুর্দার আত্মা কষ্ট পায়। কারো জন্য মনে মায়া জন্মালে, কারো জন্য মনে কষ্ট অনুভূত হলে তার সাহায্যে মৃত্যুর আগেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। তাই বলি কাদিস না। উঠে হাত–মুখ ধুয়ে নে। এরপর নাশতা করে স্যারের বাসায় গিয়ে দেখ সেখানে কোনো কাজে আসতে পারিস কি না।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী বাদল স্যার সব সময় হাসি–খুশি থাকতেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতেন না। যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। এবং কখনো সময়ের অপচয় করতেন না। প্রতিদিন একটা

নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসতেন। তার হাতে থাকতো একটি ছাতা। ছাতাটি কখনো তিনি ব্যবহার করতেন না। এমনকি কাঠফাটা রোদ বা মুষলধারে বৃষ্টির দিনেও তাকে ছাতাটি ব্যবহার করতে দেখিনি। ছাতা সঙ্গে রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার না করার কারণটি জানতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে অনেকেই এটি স্যারের মস্তিষ্কজনিত ত্রুটি বলে মনে করতো।

সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন। মাত্র পাচ গজের ব্যবধানে ক্লাসে আসতে গিয়ে স্যার প্রায় পুরো ভিজে গেলেন। আমরা ক্লাসের প্রায় সব ছাত্রছাত্রী স্যারকে অভিযুক্ত করে এক এক করে যে কথাগুলো বললাম তার সারমর্ম হলো, স্যার, এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলে তো আপনার অসুখ করবে। আর অসুখ হলে আমরা আপনার কতোকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস থেকে বঞ্চিত হবো। আপনার হাতে ছাতা ছিল অথচ আপনি ব্যবহার করেননি। আজ এর কারণ যদি আমাদের না বলেন, তাহলে আমরাও বৃষ্টিতে ভিজবো। শরীরে অসুখ বাধাবো।

আমাদের কথা শুনে স্যার কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থাকলেন। তারপর অত্যন্ত আহত কণ্ঠে বললেন, শোন, আজ বৃষ্টিতে ভেজার কারণে আমার হয়তো অসুখ হবে। এবং ওষুধ খেলে আল্লাহর রহমতে সে অসুখ ভালো হয়ে যাবে। আমিও তোমাদের ক্লাসের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের মনে প্রতিদিন যে কষ্টের বৃষ্টি হচ্ছে এবং সে বৃষ্টিতে ভিজে তাদের মনে যে অসুখ হয়েছে তাতে তারা মরতেও পারছে না আবার সুস্থ হয়ে বাচতেও পারছে না।

রূপক অর্থে এ কষ্টের বৃষ্টি হচ্ছে হিংসার রাজনীতি, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, ঘুস, আত্মসাৎ, বেকারত্ব ও নিরক্ষতা এবং অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাহীনতার বৃষ্টি। এখন সেই সব অনাকাঙ্ক্ষিত কষ্টের বৃষ্টির কবল থেকে দেশের মানুষকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন কতোকগুলো রূপক ছাতার। এ ছাতার ছায়া অহিংস রাজনীতি, আইনের নিশ্ছিদ্র কঠোর প্রয়োগ, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও সুচিকিৎসা, সর্বোপরি বেকারত্ব নিরসনে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করবে। যতোদিন এই রূপক ছাতার ছায়া দেশের মানুষের মাথায় না পড়বে ততোদিন আমার এই ছাতা সঙ্গে রাখলেও তা ব্যবহার করবো না। দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে এটাই আমার শান্তিপূর্ণ নীরব প্রতীকী প্রতিবাদ।

স্যারের বক্তব্য শেষে ক্লাসের ছাত্রী ইলোরা বললো, কিন্তু স্যার, যে উদ্দেশে আপনি ছাতা ব্যবহার করেন না তা যদি দেশের ছেলে–বুড়ো সবাই না জানে তাহলে তো আপনার প্রতিবাদের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পাবে না।

ইলোরার কথার উত্তরে স্যার বলেছিলেন, যারা শিক্ষিত, ক্ষমতাবান ও সম্মানিত, যারা একটু নিঃস্বার্থ হয়ে ইচ্ছে করলেই এ ঘুণে ধরা সমাজটাকে অতি অল্প সময়ে পাল্টে দিতে পারে। গড়ে তুলতে পারে শোষণ মুক্ত, সুখী–সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। তাদের অনেকেই আমার এই ছাতা ব্যবহার না করার কারণটি জানে। অনেক সময় তারা আমাকে চায়ের স্টলে বা বাসায় ডেকে তাদের পাশে বসিয়ে চা–বিস্কিট খাওয়ার অফারও করে। সম্মান করে হাসিমুখে কথা বলে। তবে একটু দূরে সরে এলেই শুনি আমাকে *পাগল* বলে তারা সম্বোধন করছে। হেসে হেসে একাকার হচ্ছে। তোমাদের নিয়ে আমি খুব আশাবাদী। তোমরা যখন লেখাপড়া করে মানুষের মতো মানুষ হয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের নেতৃত্ব নেবে তখন দেশের চেহারা এমনটি থাকবে না। অভাগা বাংলার বদনাম ঘুচে প্রকৃত অর্থে *সোনার বাংলা* হবে।

সেই কবে বাদল স্যার আমাদের কাদিয়ে পরলোকের বাসিন্দা হয়েছেন। কিন্তু তার রেখে যাওয়া ছাতাটি এখনো স্কুলের দফতরির কাছে আছে। হাত বদলিয়ে ছাতাটি স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরা

ব্যবহারও করে। সময়ের পরিক্রমায় ছাতার অকেজো হাতল, ঢাসা এবং কাপড়ও পাল্টানো হয়েছে। কিন্তু কেউ এর মালিকানা সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তর আসে, এটি বাদল স্যারের ছাতা।

ইসলামপুর, ধামরাই, ঢাকা থেকে

লেজ

–টি মাহমুদ

এ জীবনে সবচেয়ে বেশি হারিয়েছি ছাতা ও ঘড়ি। ছাতা হাতে নিয়ে বেরিয়েছি, ফেরার পথে হাতে আর ছাতা থাকে না। বৃষ্টি থেমে গেলে ছাতার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তাই গুটিয়ে নিয়ে সেটা হাতেই রাখি। কোনো চায়ের দোকানে কিংবা কোথাও আড্ডা মারতে গেলে ছাতাটা সেখানেই ফেলে আসি। আমার প্রিয়তমাও আমার মতোই ছাতা হারাতে ওস্তাদ। গত মাসে সে নিজের ছাতাটা হারিয়েছে তারপর একদিন আমার ছাতাটাও তার ব্যাগ থেকে উধাও হয়ে গেল কুমিল্লার *প্রাইম* বাস কাউন্টার থেকে।

বর্ষার দিনে ছাতা ছাড়া প্রেম করা যায় না। তাই এ মাসেও একটা ছাতা কিনেছি বাধ্য হয়ে। কারণ সামনে পরীক্ষা। এ সময় ভিজলে নির্ঘাত জ্বর। তাও আবার ডেঙ্গুর সম্ভবনা একশ ভাগ। নতুন ছাতাটায় একটা ক্লিপ লাগিয়েছি প্যান্টের বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। শ্রাবণের ঝির ঝির বৃষ্টির দিনে বের হলাম কুয়েত মৈত্রী হলের উদ্দেশে সদ্য কেনা ছাতাটা নিয়ে। বের হবার সময় ছাতাকে বললাম, তুই যে কবে হারিয়ে যাবি তা আল্লাহ পাক জানে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল। তাই ছাতাটা ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে বেল্টের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলাম।

হল গেটে গিয়ে কল দিলাম। অনেক্ষণ পর প্রিয়তমা এলো। চোখ–মুখ লাল করে ২২০ ভোল্টের একটা ধমক দিয়ে বললো, ছাতাটা এখানে ঝুলিয়েছো কেন? আমার বান্ধবীরা ছাদ থেকে তোমাকে দেখে বলছে যে, তোমার লেজ বের হয়েছে, দেখতে বানরের মতো লাগছে।

এবার আমি চেয়ে দেখলাম ছাতাটা সুন্দর মতো ঝুলে আছে। এটাকে বানরের লেজের মতো লাগার কথা না। তবুও তার বান্ধবী বলে কিছু বললাম না। শুধু বললাম, হারিয়ে যায়, এ জন্য ঝুলিয়েছি। তারপর ছাতাটা খুলে হাতে নিলাম।

দুজনই টিএসসি–র উদ্দেশে বের হলাম। সন্ধ্যার পর যখন রিকশায় ফিরছিলাম ঠিক তখন নিউ মার্কেটের কাছাকাছি আসতেই একজনের হাতে ছাতা দেখে আমার নতুন ছাতাটার কথা মনে পড়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার সদ্য কেনা ছাতাটা হাতে নেই। বুকের ভেতরটা ধুক করে উঠলো। দেখি আমার প্রিয়তমার হাতেও নেই। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার বানরের লেজটি কোথায়?

ঢাকা থেকে

পরিবর্তন

– মাহবুব

১৯৮৫ সালের কথা। বাবা সব ভাইবোনকে হতবাক করে দিয়ে জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আমার জন্য গ্রামের হাট থেকে কিনে আনলেন নানান রঙের একটি ছাতা। তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। আগের বছর অবশ্য বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্লাসে প্রথম হও, একটা ছাতা কিনে দেবো। ছাতা পাওয়ার লোভে খুব ভালো পড়াশোনা করেছিলাম এবং প্রথম হয়েছিলাম।

শিক্ষক বাবা সাতটি ভাইবোনের পড়াশোনার খরচ যোগাতে অনেক হিমশিম খেতেন। তাই সামান্য একটি ছাতার জন্য তাকে অনেক দিন আমার কাছে ছোট থাকতে হয়েছিল। ছাতাটি কিনে দেয়ার পর ভাইবোনদের সঙ্গে আমার অনেক ঝগড়া হয়েছিল। কারণ সবাই রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে স্কুল, কলেজে যেতো। অবশ্য আরেকটা কারণ ছিল ছাতাটির রঙ। পরবর্তী দিনগুলোতে বাহাদুরের মতোই স্কুলে যাওয়ার–আসা করতাম। বাড়ি থেকে স্কুল দূরে হওয়ায় কতোজনই না আমার সঙ্গে ভাব জমাতো।

স্কুলে যাওয়া–আসার পথে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে এ বছরেই সেই ছাতা ভেঙে গেল। আমি আকারে সবার চেয়ে ছোট হওয়াতে প্রায়ই ছাতা যুদ্ধে হারতাম এবং ছাতায় দুই চারটা করে ফুটো হতো।

পরের বছর প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট হলো। আমার থানায় প্রথম হলাম। ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে আমাকে চার কিলোমিটার দূরে ভর্তি করালেন বাবা। ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। তাই অনেক দাম দিয়ে সুন্দর হাতল বিশিষ্ট বিশাল একটা ছাতা বাবা কিনে দিলেন।

আগেও বলেছি, সাইজে ছিলাম ছোট। প্রতিদিন বইয়ের পাশাপাশি ছাতাটির হাতল পেছনে শার্টের কালারে ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়া–আসা করতাম। ছাতাটি অনেক বড় হওয়ায় এর নিচের অংশ মাটিতে লেগে যেতো এবং হাটার সময় আওয়াজ হতো। পড়ন্ত বিকেলে স্কুল থেকে আমার আগমনের প্রত্যাশায় মা দাড়িয়ে থাকতেন। আমার ছাতাটিকে স্কুলের হেড স্যার বিশেষ পছন্দ করতেন। বৃষ্টির দিনে বাজারে যাওয়ার প্রয়োজন হলে আমার ছাতাটি নিতেন। তাছাড়া কখনো কখনো বেতের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। আমি তখন এইটে পড়ি।

একদিন তিনি ভয়েস চেঞ্জ পড়াচ্ছিলেন। আমি আর একটা ছেলে ছাড়া কেউ উত্তর দিতে পারছিল না। এক পর্যায়ে স্যার ক্ষোভে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার ছাতাটি নিয়ে ছেলেমেয়েদের বেদম প্রহার করতে লাগলেন। আট নয়জনের পালা শেষ হওয়ার পর হঠাৎ আমার মহামূল্যবান সেই ছাতার হাতল ভেঙে যায়। হাউমাউ করে কেদে স্যারকে জড়িয়ে ধরে বলি, আমার ছা–তা।

অনেক চেষ্টা করেও স্যার আমার বন্ধন মুক্ত হতে পারেননি। পরে অন্যান্য স্যারেরা আমাকে বুঝিয়ে স্যারকে বন্ধন মুক্ত করেন। বাড়িতে এসেও সেদিন ছাতা বিয়োগে অনেক কান্নাকাটি করেছিলাম। পরে বেশ কয়েকদিন স্যারকে ছাতার কথা মনে করিয়ে দিতাম। পরবর্তী কালে স্যার আমার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে নতুন একটা ছাতা কিনে দিয়েছিলেন।

আজ আমার ভাইবোনদের বড় তিনজন লেখাপড়ায় সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে মোটামুটি সম্মানজনক চাকরি করছেন। ছোট চারজনও দেশের বিখ্যাত কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত। সংসারে এখন আর আগের মতো অভাব নেই। তাদের আছে মূল্যবান ছাতা। আমার আছে বেশ দামি একটা জাপানি

ছাতা। অনেকটা ফ্যাশনের জন্যই এ ছাতাটা ব্যবহার করি। কিন্তু এখন মা পড়ন্ত বিকেলে আমার অপেক্ষায় থাকেন না। ছাতা অতি তুচ্ছ জিনিস। ভাইবোনদের অনেক বড় আবদারও এখন পূর্ণ হয়ে যায়। রোদ বৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিলেই অজান্তে মনে পড়ে বাবা মায়ের কথা। এখন মা তার ছেলের ছাতা মাথায় বাড়ি আসা দেখেন না।

ছোটবেলার সেদিনে বাবা আমাকে ছাতা কিনে দিতে পেরে মনে হয়েছিল, তিনি বুঝি পৃথিবীর বড় কিছু আমাকে দিয়েছিলেন। সময় কতো দ্রুত বদলায়। শুধু হারিয়ে যায় কিছু মানুষ, থেকে যায় বুকভরা যন্ত্রণা। বাবার সেই ক্লান্তিমাখা চেহারা আজ এতো মনে পড়ছে কেন?

কুমিল্লা থেকে

নেপথ্য

– সামছুল আলম মিলন

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। বাসার কাছাকাছি কলেজ। ভালো ছাত্র হিসেবে কলেজে আমার পরিচিতি সর্বাধিক। কারণ আমাদের এলাকার স্বনামধন্য স্কুলটির সেকেন্ড বয় ছিলাম। এসএসসিতে ভালো রেজাল্টও করেছি। এরপর অর্থাৎ এসএসসি–র রেজাল্ট–এর পর বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমাকে দূরের কলেজে মা ভর্তি হতে দিলেন না। ভর্তি হলাম বাসার কাছের কলেজটিতেই।

যাক, এখনকার দিনে কলেজে পড়া মানে স্যারের বাসায় পার্টটাইম পড়া। আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে তখন থেকেই ক্লাসের কয়েকটা মেয়ে আমাদের ব্যাচে প্রাইভেট পড়ার জন্য খুবই ঝুকে পড়ে। কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে ব্যাচ করেছিলাম। তাই তাদের সুযোগ হয়নি।

সেকেন্ড ইয়ার–এ কয়েকজন প্রাইভেট পড়বে না বলে জানায়। তখন তারা পুরো সুযোগটা নেয়। নতুন ব্যাচ তৈরি হয় আমি, নাবি, সুমন, লিরা, শ্রাবণী আর রুনি এই ছয়জন মিলে। গণিত, পদার্থ, রসায়ন সব সাবজেক্টে আমরা ছয়জনই ছিলাম স্যারদের প্রিয় ব্যাচ এবং প্রিয় ছাত্র।

এক মেঘলা দিনে আমরা সবাই পড়তে গিয়েছি পদার্থ বিজ্ঞান স্যারের বাসায়। হঠাৎ শুরু হলো রিমঝিম বৃষ্টি। সেদিন কয়েক ঘণ্টা ধরে পড়ার পরও যখন বৃষ্টি থামছিল না তখন স্যারকে আমরা বললাম, স্যার, সন্ধ্যা হচ্ছে, আমরা এখন বাসায় যাবো।

স্যার বললেন, তোমরা কি বৃষ্টির মধ্যে যেতে পারবে?

সুমন বললো, আমাদের ছাতা আছে স্যার।

পরে দেখা গেল লিরার ছাতা নেই। আমার বাসার দিকেই লিরাদের বাসা। তাই তাকে বাসায় পৌছানোর দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। দুজন ছোট একটা ছাতার নিচে পাশাপাশি শরীর ঘেষে হাটছি। কিছুদূর আসতে না আসতেই বৃষ্টির গতিবেগ বাড়তে থাকলো এবং সঙ্গে বাতাস। দুজনের শরীর প্রায় অর্ধভেজা। রাস্তায় অন্য কোনো পথচারী নেই বললেই চলে। এমন সময় প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটায় আমার ছাতাটি উল্টে গেল। কি আর করা, কাছেই একটা ভাঙা পুরনো বিল্ডিংয়ের পাশে দুইজন কোনোমতে আশ্রয় নিলাম। এরপর যতোই বাতাস ও বৃষ্টি বাড়তে লাগলো ততোই আমার ঘনিষ্ঠ হতে থাকলো লিরা। এক সময় দেখা গেল, আমরা একে অপরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে আছি।

দুইজনের চেতনা যখন ফিরে এলো তখন বৃষ্টির বেগ অনেকটা কমে গেছে। তড়িঘড়ি করে লিরাকে তাদের বাসায় পৌছে দিয়ে বাসায় ফিরে আসি। এরপর সারা রাত লিরাকে নিয়ে, লিরার দেয়া উষ্ণতা নিয়ে ভাবতে থাকি। পরের দিন ক্লাসে গিয়ে লিরার সঙ্গে দেখা। সে কোনোভাবেই আমার দিকে আগের মতো তাকাতে পারছিল না। শুধু একবার কাছে এসে বলে গেল, ক্লাস শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

ক্লাস শেষ হলে আমরা দুইজন কলেজের পেছনে চলে যাই।

লিরা বললো, সামু, গতকালের ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আসলে উপরওয়ালার ইচ্ছায় এসব ঘটেছে। যদি ছাতাটি উল্টে না যেতো তাহলে আমরা বিড়াল ভেজাও ভিজতাম না এবং এ রকম কামনারও সৃষ্টি হতো না। তোমাকে অনেক আগে থেকে ভালোবাসি। তাই খোদা গতকাল দুজনকে একটু কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল।

এরপর আমাদের দুজনের প্রেম হয়ে যায় সবার অজান্তে।

পড়ালেখার পাশাপাশি দুইজন দুষ্টুমি করতাম প্রচুর। এইচএসসি পরীক্ষা হলো। রেজাল্ট হলো। আমরা দুজনই স্টার পেলাম। ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোচিং কোথায় করবো এ নিয়ে আমি আর লিরা ভাবছি। কিন্তু আমাকে কোচিং করার জন্য ঢাকায় পাঠায় আমার বাবা। এবং লিরা রংপুরে কোচিং করে। ভর্তি পরীক্ষায় আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লিরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে চান্স পায়।

এখন আমরা দুজন খুব ভালোই আছি। মজায় আছি। ছুটি পেলেই দেখা হয়। দুজনের কথা হয়। হয় ভাবের দেয়া-নেয়া। একটি ছাতায় সেদিন আমাদেরকে এক করে দিয়েছে। আজো আমরা এক ও অভিন্ন।

ময়মনসিংহ থেকে

নিখুত

– এএইচএম শাহাদুল্লাহ মিন্টু

চুপচাপ স্বভাবের ছিল মেয়েটি। চেহারায় ছিল নজরকাড়া স্নিগ্ধতা। স্যারের লেকচারের সময় গম্ভীরভাবে নোট নেয়া আর ক্লাস না থাকলে সেমিনার অথবা লাইব্রেরিতে বইয়ের মাঝে মুখ গুজে বসে থাকা এভাবেই কাটছিল তার ইউনিভার্সিটি জীবনটা। শাটল ট্রেনের প্রচণ্ড হই হুল্লোড়ের মধ্যেও আশ্চর্য রকমের একাকী দেখাতো তাকে। সে বোধহয় জানতোও না এক জোড়া মুগ্ধ চোখ সব সময় তার একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য তাকে ছুয়ে যেতো।

ইউনিভার্সিটি স্টেশন থেকে আর্টস ফ্যাকাল্টি প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বের পথটা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে পায়ে হেটেই পাড়ি দিতে হয়। কর্তৃপক্ষের চরম দুর্নীতি আর অব্যবস্থার কারণে ছাত্ররা হারিয়েছে তাদের বাসে চড়ার অধিকার। যদিও ভাড়ার টাকাটা শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত দিতে হচ্ছে তবুও চরম মিথ্যাবাদী ইউনিভার্সিটি প্রশাসন এই পুরো পথটা জুড়ে শেড দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ভুলে যেতে বেশি সময় নেয়নি। এক ফোটা ছায়াও না থাকায় এই পথটা যেন শুকনো মরুভূমি। ফলে শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা সব ঋতুতেই শরীরটাকে বাচাতে শিক্ষার্থীদেরকে এই পথ দিয়ে যাবার সময় ছাতা ব্যবহার করতেই হয়।

একদিন সে সম্ভবত ছাতা আনতে ভুলে গিয়েছিল। তাই এক বান্ধবীর ছাতার নিচে আশ্রয় নিয়েই পথটা পাড়ি দিতে হলো তাকে। সেদিন ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছিল পৌনে একটায়। সবাই ছুটতে লাগলাম দেড়টার ট্রেন ধরার জন্য। সারা গায়ে ঘাম নিয়ে স্টেশনে পৌছি। ছাত্র সংখ্যার তুলনায় ট্রেনে বগির পরিমাণ এতো কম যে, বসার জন্য একটা সিট পাওয়া পৃথিবীর দুরূহ কাজগুলোর মধ্যে একটি। অবশ্য কপাল ভালো, আমার আইন বিভাগের বন্ধুদের কল্যাণে সিট একটা সেদিন পেয়েই গেলাম। দেরি না করে ঝটপট বসে পড়লাম। তখনই দেখি সেই মেয়েটা আমাদের বগিতেই ভিড়ের মাঝে দাড়িয়ে আছে। সারা মুখ তার ঘামে ভরে গেছে। প্রচণ্ড মায়া লাগলো আমার। উঠে দাড়িয়ে বসতে বললাম আমার সিটটায়।

না, না আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। রিনরিন কণ্ঠে জবাব দিল সে।

আবার অনুরোধ করলাম।

অবস্থা আগের মতোই থাকলো।

বন্ধুদের খিক খিক শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। একে তো কিছু বলতে পারলাম না। কিন্তু আমিও বসলাম না সেই সিটে। দাড়িয়ে থাকাদের মধ্যে একজন সঙ্গে সঙ্গে খালিস্থান পূরণ করলো। তার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ব্যাপারটায় বেশ বিব্রত বোধ করছে।

ট্রেন যখন ক্যান্টনমেন্ট অতিক্রম করছে তখন জানালায় বসে থাকা বন্ধুটা বলে উঠলো, আহ! বৃষ্টি পড়ছে, দ্যাখ দ্যাখ। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের পর বৃষ্টিটা যেন শান্তির পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। ভ্যাপসা গরমটা কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

একটু পরেই অবশ্য ব্যাপারটা বেশ বিব্রতকর হয়ে উঠলো। কারণ সিটের অভাবে অনেক ছাত্রছাত্রীকেই জানালা বা দরজার পাদানিতে বসতে হয়। জানালা বা দরজায় কোনো শাটার না থাকাতে এই অংশে যারা ছিল তাদের কাকভেজা হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

আমরা যারা সিটের দুই সারির মাঝখানটায় দাড়ানো ছিলাম তারা বেচে গেলাম এ যাত্রায়। ষোলশহর জাংশনে পৌছাতেই ট্রেন প্রায় খালি হয়ে গেল। বন্ধুদেরও প্রায় সবাই নেমে গেল। বেশ কিছু সিট খালি হয়ে যাওয়াতে বসে পড়লাম দুজনেই। মুখোমুখি বসে আছি দুজন। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই। এভাবেই যখন ঝাউতলা জাংশনে পৌছালাম তখনো বৃষ্টি হচ্ছে অঝোরধারায়।

ঝাউতলাতেই নামতে হবে তাকে। কিন্তু দরজার কাছে গিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে দাড়িয়ে থাকলো সে। বুঝলাম সঙ্গে সত্যিই ছাতা নেই। ট্রেন যখন হুইসল দিল তখন অগত্যা বৃষ্টি মাথায় নিয়েই নেমে পড়লো সে। এ সময়েই জানালা দিয়ে ছাতাটা খুলে তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। বললাম, কোনো কথা নয়, নাও এটা।

সে হতবাক অবস্থায় নিল ছাতাটা।

ট্রেন চলতে শুরু করলে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখি তখনো সে দাড়িয়ে আছে। বিদায় জানাতে হাত নাড়লাম। প্রত্যুত্তর পেলাম না।

আধভেজা অবস্থায় মাথাটা ঢোকালাম ভেতরে। বটতলী স্টেশন থেকে বাসায় ফিরলাম বৃষ্টিতে গোসল করতে করতে। খারাপ লাগছিল না একটুও।

পরদিন ইউনিভার্সিটি স্টেশনে দেখা হলো। ছাতাটা ফিরিয়ে দেয়ার সময় মিষ্টি করে হাসলো মুহূর্তের জন্য। বিস্ময় গোপন করতে পারলাম না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, একি, তুমি হাসতে পারো দেখছি।

গজদন্ত বের করা হাসিতে ভেঙে পড়লো সে এ কথা শুনে।
বন্ধুর লাথি খেয়ে যখন চমক ভাঙলো তখন দেখি সে বেশ এগিয়ে গেছে সামনে।
এখন আমরা পাশাপাশি হেটে পাড়ি দিই কাটা পাহাড়ের পথটা। তেমন দীর্ঘ মনে হয় না রাস্তাটা।

চট্টগ্রাম থেকে

নোনা জল

– সেলিনা বিলকিস

বৃষ্টি ঝরছে।
ডিসগাস্টিং!
অকারণেই মন খারাপ হয়ে যায়। বন্দিনী রাজকন্যার মতো জানালার বাইরে দূরে তাকিয়ে থাকা।
টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে ভিড় জমায়।
ভাবতে ভাবতে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।
ক্যাম্পাসে তখনো পুরোপুরি পুরনো হয়ে যাইনি। একই ডিপার্টমেন্টের রুক্ষ এক তরুণ বেশ কিছুদিন থেকে পর্যবেক্ষণ করছে। বুঝেও না বোঝার ভান করি। তারপর কিছু টুকরো কথা।
একদিন বলেই ফেললো, বিকাল সাড়ে পাচটায় আসবো।
কি মনে হলো জানি না। মনের অজান্তেই নিজেকে সাজালাম খুব যত্নে। আকাশে মেঘ। কিন্তু তাকে পাত্তা দিলাম না। হল থেকে কিছুটা দূরে কয়েক মিনিট আগে থেকেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।
এর মধ্যে জোরে বাতাস বইতে শুরু করছে, সঙ্গে বৃষ্টি। ছাতা আনার কথা মনেই ছিল না। তিনটা ছেলে দূরে দাড়িয়ে কিছু বলে হেসে উঠলো। প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে দ্রুত হলে ফিরে এলাম। একটু পরেই আকাশ ভেঙে নেমে এলো বৃষ্টি। আমাকে না পেয়ে প্রচণ্ড অভিমানী সেদিন থেকেই আমাকে ভুল বুঝতে শুরু করলো। দূর থেকে দুজন দুজনকে দৃষ্টিতে অনুসরণ করতাম। দূরত্ব বাড়ার বদলে দূরত্ব কমতে থাকলো। এর মাঝে একটা ভুল করলাম। কিছুটা ভুল তারও ছিল। তবুও আমাদের মাঝে দূরত্ব কমতেই থাকলো। সব পেছনে ফেলে একদিন আমরা কাছাকাছি চলে এলাম। কিন্তু ততোদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমরা উভয়েই সৃষ্টি করেছিলাম কিছু সীমাবদ্ধতা যা অতিক্রম করে একে অপরের হওয়া কঠিন। এরপরও আমরা উপেক্ষা করতে পারতাম না পারস্পরিক দুর্নিবার আকর্ষণ। তাকে একদিন না দেখলে অস্থির হয়ে যেতাম। তাকে দেখামাত্রই আমার সব অস্থিরতা চলে যেতো।
প্রতিদিন বিকেলে আসতো সে। বৃষ্টি হলেও আমার কোনো দুশ্চিন্তা হতো না। জানতাম, সে আসবেই। ছাতা নিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। রিকশা থেকে নেমেই লাফ দিয়ে আমার কাছে চলে আসতো। আমরা দাড়িয়ে কথা বলতাম।
একটু ঘনিষ্ঠতা পাবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই বলতো গম্ভীরভাবে, কেন যে বৃষ্টি হচ্ছে না! যতো বৃষ্টিই হোক নয়টার আগে হলে ঢুকতাম না। খুব বৃষ্টি হলে হল গেটে জুটি কমে যেতো।
একদিন বললাম, বৃষ্টি নামলেই বোঝা যায় কার প্রেম কতো গভীর।
কি বলতে চাচ্ছিস তুই? প্রশ্ন করলো।
কিছুই না।

যখন হল গেট ফাকা থাকতো তখন চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে টুক করে তার ঠোটের উষ্ণতা দিতো আমার ঠোটে। কিছুই হয়নি এমন ভাব করতে গিয়ে শক্ত হয়ে থাকতো। হাসি পেতো তার ছেলেমানুষী দেখে। সে হলে ফিরে যাওয়ার সময় কতোদিন বলেছি, ছাতা নিয়ে যা, ঠাণ্ডা লাগবে। কথায় কান দিতো না। বৃষ্টিতে ভিজে বড় বড় পা ফেলে চলে যেতো। এভাবেই কেটে গেল পাচটি বছর।

অনেক দিন হয় তাকে দেখি না। ভুলতে পারি না কিছুতেই। কিন্তু যন্ত্রণাময় স্মৃতি নিয়ে অজানা অসুখী জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। ভাবতে গাল ধুয়ে যায় নোনা জলে। সেদিন বিকেলে নিজেকে বৃষ্টির থেকে আড়াল করলে এড়িয়ে যেতে পারতাম অনেক কষ্টকে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

গ্রামদাদু

– মোহাম্মদ শাফিন খান

বাংলাদেশে এমন অনেক পরিবার আছে যাদের বর্ষার সময় ছাতার অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আমাদের পরিবারটি ঠিক এমনই একটি পরিবার। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে ছাতা ছাড়া কয়টি বর্ষা মরসুম পার করতে পারি তার রেকর্ড করার প্রতিযোগিতায় নেমেছি আমরা।

নিম্নবিত্তের সংসারে সাংসারিক পেটের খরচ বাদে যে কোনো খরচই খুব কষ্ট করে করতে হয়। যে দুই একটি ছাতা বাবা অতি কষ্টে কিনতেন তাও ইদুরে কাটতো। বাবা রাগ করে ছাতা কেনাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে বৃষ্টিতে ভিজে প্রায়ই বাবা জ্বরে ভুগতেন। বাড়ির সমস্ত কাজ বাবাকে সামলাতে হতো। কারণ আমরা তখন ছোট ছিলাম। তাই বৃষ্টি এলে বাবা তা অগ্রাহ্য করে কাজে বেরিয়ে পড়তেন। অবশ্য এর কঠিন মূল্য স্বরূপ তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে নিউমনিয়ার ছোবলে।

বাবা মারা যাওয়ার পর গ্রামদাদুর স্নেহ, ভালোবাসা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় পাওয়া। গ্রামের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি। গ্রামের প্রতিটি মানুষের পাশে তিনি থাকেন যুক্তি ও পরামর্শ দিতে। দাদুর একটি মাত্র ছেলে। অনেক দিন হলো সে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। এরপর থেকে দাদু একা। জীবনের শেষ ট্রেন ধরার জন্য সংগ্রাম করে চলেছেন। দাদুর হাতে সারা বছরই একটা ছাতা থাকতো। ছাতাটাকে বর্ষা ছাড়া দাদু এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া শরীরটার সমস্ত ভার এই ছাতাটা বহন করে।

দাদুর সঙ্গে দাদুর ছাতাটিও যেন বার্ধক্যে পৌছেছে। বেসরকারি স্কুল মাস্টার দাদুকে চাকরি থেকে বিদায় দেয়ার অনুষ্ঠানে এই ছাতাটি উপহার দিয়েছিল। অর্থাৎ তার সারা জীবনের সঞ্চয় বলতে এই ছাতা। তাই বোধহয় ছাতাটিকে এতো যত্নে দাদু বয়ে বেড়াতেন।

একদিনের ঘটনা। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের বারান্দায় দাড়িয়ে আছি। বাড়ি যাওয়ার জন্য ছটফট করছি। মনে মনে দাদুকে আশা করছি। কেননা বৃষ্টির দিনে ছুটির সময় বাড়িতে পৌছে দিতেন দাদু। তার বিখ্যাত ছাতা নিয়ে তিনি আসবেনই আমাকে নিতে। এই বুঝি দাদু এসে বলছেন, চলে আয় দাদু। কিন্তু না। আজ আর তিনি এলেন না। বাধ্য হয়ে জামা খুলে বইগুলো জামায় জড়িয়ে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়লাম বাড়ির পথে।

হঠাৎ মাঠের মধ্যে দাদুর সেই বিখ্যাত ছাতা নজরে এলো। দাদু বৃষ্টির মধ্যে মাঠে এভাবে বসে আছে কেন? দৌড়ে গেলাম দাদুর কাছে। দেখলাম একটি ছাগলকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন।

আমাকে দেখে দাদু স্বস্তি পেলেন। বললেন, ভালোই হলো দাদু! তুই এসেছিস। দেখতো, ছাগলটা কে বেধে রেখেছে। কিন্তু বৃষ্টি নামার আগে একে মাঠ থেকে নিয়ে যেতেই ভুলে গেছে এর মালিক। এদিকে ছাগলটার মাথায় পানি জমলে ছাগলটা বাচবে না। আমার এই শরীর নিয়ে তো একে কোলে নিতে পারছি না। তুই একে একটু কোলের মধ্যে নিয়ে আমার ছাতার তলায় চল, একে বাড়ি পৌছে দিই।

দাদুর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুইয়ে গেল। আমাকে স্কুল থেকে নিতে অসেননি বলে এতোক্ষণ যে অভিমান ছিল তা ধুয়েমুছে সব একাকার।

দাদু যখন বিছানা নিলেন তখন দাদুকে প্রায়ই বলতাম, দাদু, তোমার ছেলেকে খবর দিই। ছেলের কথা শুনে দাদুর দুই চোখ ভরে জল আসতো এবং বলতেন, জানিস দাদু, আমি নাকি তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমার ওপর অভিমান করে সে আজ প্রবাসে। ছোট্টবেলায় সে যখন কোনো কিছু বুঝতে শেখেনি তখন তোর দাদি মারা যায়। এরপর থেকে বুকের সব স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে তাকে মানুষ করেছি। আরো বলতেন, এই যে আমার ছেড়া ছাতাটা যেমন আমাকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে ঠিক তেমনি আমার কিছু না থাকলেও তার মাথার ওপরে ছেড়া ছাতার মতো থেকেছি। সমস্ত আঘাত থেকে রক্ষা করে একটু একটু করে বড় করে তুলেছি।

দাদু আর বলতে পারতেন না। একদিন দাদু চলে গেলেন। জীবনের শেষ ট্রেন ধরে অজানা দেশে যাবার আগে দাদু তার ছাতাটি আমাকে দিয়েছিলেন। এখনো বর্ষা এলে যখন ছাতাটি ব্যবহার করি তখন মনে হয়, দাদু বুঝি পাশেই আছেন। তার ছায়া যেন আমাকে অনুসরণ করে চলে। ছাতাটা ছেড়া হলেও বৃষ্টির দিনে এ যে কতো নিশ্চিন্ত আশ্রয় সেটা অনুভব করি।

মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা থেকে

রহস্য

– শান্তনু চৌধুরী

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বর্ষাকালে একদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলো। যখন ছাতা নিয়ে বের হতে যাবো তখন দেখলাম দৌড়াতে দৌড়াতে কয়েকটা মেয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের বারান্দায় এসে দাড়ালো। মেয়েগুলো আমাদের ক্লাসেই পড়ে।

আমাদের বাড়িটা পাড়ার অন্যান্য বাড়ি থেকে আলাদা আর তার অদূরেই স্কুলে যাওয়ার রাস্তা। বারান্দায় দাড়ানো মেয়েগুলোর কারো ছাতা নেই। আমরা সবাই মিলে অপেক্ষা করছি বৃষ্টি থামার জন্য। একদিকে ক্লাসমেট হওয়াতে তাদের ফেলে একা যেতেও পারছি না। অন্যদিকে বাড়িতে অতিরিক্ত কোনো ছাতা না থাকায় তাদেরকে সাহায্যও করতে পারছি না। এগারোটায় আমাদের ক্লাস। তখনো বিশ মিনিট বাকি। স্কুল অবশ্য খুব দূরে নয় আমাদের বাড়ি থেকে।

বৃষ্টি না থামাতে শেষে সিদ্ধান্ত নিতে হলো তাদেরকে এক একজন করে স্কুলে পৌছে দিয়ে আসবো। মোট চারজন এরা। সবাই সুন্দরী। আমার ব্যাগটা কাধ থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে সবার আগে শিউলিকে ছাতার ভেতর করে পাশে নিয়ে চলছি স্কুলের উদ্দেশে। এমনিতে ছাতা ছোট, তার উপর

এই প্রথম কোনো নারীর এতো কাছাকাছি আসাতে শরীরে কেমন যেন রোমাঞ্চ বোধ হচ্ছে। তাছাড়া গায়ে গা লাগছে। এখানে বলে রাখা উচিত, আমাদের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা রুমে পড়ানো হয়।

যাক, আমরা দুইজন পাশাপাশি এগিয়ে চলেছি, কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমি তাকিয়ে আছি তার স্তন দুটোর দিকে। কেমন খাড়া খাড়া। সেখানে সামান্য বৃষ্টির ছাট পড়ায় কাপড়টা একটু লেপ্টে আছে। নিপল দুটো ফেপে ওঠা অবস্থা দেখে গা শিরশির করছে। অপূর্ব লাগছে সেই দুটোকে। খুব ইচ্ছা করছে ধরে দেখতে। ইচ্ছা করেই যেন আমার বাহু লেগে যাচ্ছে সেখানে। সে কিছু বলছে না। চেষ্টা করছি লোভ সামলাতে। স্কুলের বারান্দায় পৌছিয়ে দেয়ার আগে একটা ধাধা জিজ্ঞাসা করলাম।

ঠেলা দিলে খুলে যায়, ভেতরে গেলে আরাম পায়।

শিউলির কান লাল হয়ে গেল।

হাসলাম। কতো সহজ ধাধা। অথচ কি জটিলই না ভাবছে মেয়েটা।

এরপর আরো দুজনকে পৌছে দিলাম স্কুলে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সবশেষে রইলো পারমিতা। আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে যেন মহাকাল দুলছে সেখানে। তাকে এমনিতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু তার বাবা, চাচার ভারী ভারী পদবির কথা শুনে ভালোবাসা প্রকাশ করার সাহস হয়নি। আজকে উপায় নেই, এক সঙ্গে যেতেই হবে। আমিও চাই, আমাদের দুজনকে নিয়ে একটা রোমান্টিক দৃশ্যের অবতারণা হোক। এমনিতে বৃষ্টির বেগ কমে আসছে।

আমরা স্কুলের পথে রওনা হলাম। দুজনের কাধে ব্যাগ থাকাতে ছাতার পরিধি একটু কমেছে। ঘনিষ্ঠ হতে হয়েছে দুজনকেই। আমি বার বার তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছি।

সে বলছে, ভিজে যাচ্ছি তো?

আবার কাছে চলে আসতে হলো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি চোরাচোখে। এতো সুন্দরী মুখশ্রী আগে দেখিনি। ছাতার ওপর বৃষ্টির পানি পড়ার পর ছাতার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে যে পানি ভেতরে ঢুকছে তারই দুই এক বিন্দু তার কেশরাজির সঙ্গে লেগে মুক্তোর দানার মতো অবয়ব তৈরি করেছে। গায়ে গা লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। অপর তিনজনের ক্ষেত্রে নিজেকে সংরবণ করতে পারলেও পারমিতার ক্ষেত্রে পারলাম না। স্কুলে পৌছার কিছুদূর আগে তাকে দাড়াতে বলে তার গালে আলতো করে একটা চুমু খেলাম।

পারমিতা কিছু বললো না। চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে। এর মধ্যে কখন বৃষ্টি থেমে গেছে খেয়াল করিনি।

আমি ছাতা গুটিয়ে নিলাম। পারমিতা দ্রুত পায়ে চলে গেল ক্লাস রুমের দিকে। সেদিনের প্রথম ক্লাসটা ইচ্ছা করেই মিস করলাম। এরপর থেকে পারমিতা কোনোদিন আমার সঙ্গে আর কথা বলেনি। এমনকি স্কুলের বিদায় দিনেও না। নিজ থেকে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। সে এক রহস্য যার কূল–কিনারা আজো খুজে পাইনি।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি থেকে

নির্জন বনে

– মোহাম্মদ রকিবুল ইসলাম ফারুক

ঢাকাতে সরকারি চাকরি করি। অনেক দিন হলো বাড়ি যাইনি। পূজা উপলক্ষে তিন দিনের ছুটি এবং এর সঙ্গে শুক্র, শনি অর্থাৎ পাচ দিনের ছুটি। আজ অফিস শেষ করে এসে বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতাটা নিয়ে রুম থেকে রাস্তায় বের হলাম। রাস্তায় দুইটা খালি রিকশা আছে। কিন্তু কোনো চালক নেই।

পাশের দোকানে রিকশার কথা বলতেই একজন বলে উঠলো, কোথায় যাবেন স্যার।

মহাখালী বাস স্টেশনে।

এ কথা বলতেই চালক দোকান থেকে একটা ছাতা নিয়ে এসে বললো, স্যার, চলেন।

রিকশা চালনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, সে সদ্য গ্রাম থেকে আসা। সে এক হাতে ছাতা ও অন্য হাতে রিকশা নিয়ন্ত্রণ করছে। কিছুদূর যাওয়ার পর বাতাসে তার ছাতাটা উল্টে গেল এবং সে ভিজে গেল। আমাকে বললো, স্যার, আমার ছাতাটা একটু ধরেন এবং ভিজেই সে রিকশা চালাতে লাগলো।

মনে মনে ভাবি, ছাতা থাকা সত্ত্বেও পারেনি নিজেকে বৃষ্টি থেকে বাচাতে। একটু সুখের খোজে ঘুরছে সে সকল দুর্যোগ মাথায় নিয়ে। এভাবেই বাস স্টেশনে এসে পৌছালাম।

টাঙ্গাইলের একটি বাসে উঠে দেখি কোথাও সিট খালি নেই। তবে পেছনে একটা সিট খালি আছে। তাও আবার বিশ বাইশ বছরের যুবতী মেয়ের পাশে। মেয়ের কাছে যেতেই নাড়ির স্পন্দন বেড়ে গেল। তারপরও নিজকে সামলিয়ে বললাম, ম্যাডাম, যদি কিছু মনে না করেন তাহলে এই সিটটাতে বসতে পারি? তার অনুমতিক্রমে ছাতাটা মালপত্র রাখার স্থানে রেখে সিটে গিয়ে বসলাম। নাড়ির স্পন্দন বাড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের কাঞ্চনপুর এসে পৌছালাম। বাসে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আকাশ এখনো মেঘলা।

বাস থেকে নেমে সোজা পায়ে হেটে মধুপুর বনের সরু পথ দিয়ে চললাম বাড়ির দিকে। চলার পথে আমার চাচাতো বোন শিউলির সঙ্গে দেখা। হাতে কিছু খাতা ও একটা ছাতা রয়েছে। তার ছাতা দেখে আমার ছাতাটার কথা মনে পড়লো। আমার ছাতাটা বাসের মধ্যে রয়ে গেছে।

শিউলি বললো, কেমন আছেন ভাইয়া, ভালো? কোথা থেকে আসলেন?

ঢাকা থেকে। তুমি কেমন আছো?

ভালো। প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফিরছিলাম।

কথা বলতে বলতে চলছিলাম। কিন্তু আবার বৃষ্টি শুরু হলো। এই বৃষ্টির মধ্যে কোথায় আশ্রয় নেবো। আশ্রয় নেয়ার মতো কোনো জায়গায় নেই। বাধ্য হয়ে দুজনই এক ছাতার নিচে আশ্রয় নিলাম এবং বনের আকাবাকা সুরু পথ দিয়ে চললাম। বাড়ি এখনো আধা কিলোমিটার দূরে।

এই প্রথম কোনো মেয়ের শরীরের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে পথ চলতে শুরু করলাম। তাও আবার এই নির্জন বনের মধ্যে দিয়ে। আমার শরীর শিউরে উঠলো। হৃদয়ের কম্পন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। বৃষ্টিতে একটু একটু ভিজে যাচ্ছি বলে শিউলিকে পেছনের দিকে বাম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দুইজন আরো কাছাকাছি হলাম। এবং হাটতে হাটতে হঠাৎ শিউলির বাম পাশে পাহাড়ের মতো উচু জায়গাটাতে হাত লেগে যায়। কিন্তু শিউলি কিছুই বললো না। হাত লাগতেই আরো শিউরে উঠলাম।

একটু পরে নিজ ইচ্ছায় হাত লাগালাম। তাও শিউলি কিছু বলছে না। তাই আমি আস্তে আস্তে উচু পাহাড়টায় চাপতে লাগলাম। শিউলির হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে এক হাতে ছাতাটা ধরে রেখেছি এবং অন্যহাতে অজানা সে খেলা খেলছি। শিউলিকে বললাম, তুমি কিছু বলছো না যে। শিউলি কিছুই না বলে আমাকে তার ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। শিউলি যখন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে তখন তো আর কোনো বাধা রইলো না। আমার সাহস আরো বেড়ে গেল। আমি ছাতা দিয়ে নিজেদেরকে আড়াল করে তার আপেলের মতো গালটাতে চুমুর ছাপ একে দিলাম।

শিউলি বললো, ঠিক হচ্ছে না কিন্তু।

আমি দুষ্টুমি করে বললাম, বনের মধ্যে কেউ নেই এবং থাকলেই বা কি হবে। ছাতা তো আমাদের আড়াল করে রেখেছে।

তারপর শিউলিও আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। এক অজানা ভালোলাগাতে আমরা ভাসতে লাগলাম এবং বাড়ির কাছে এসে পৌছালাম। জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হলো। ধন্যবাদ জানাই আমার হারানো ছাতা, শিউলি ও শিউলির ছাতাকে।

ঢাকা সেনানিবাস থেকে

ইছামতি নদী

– মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বাবু

বিনা পাসপোর্টে তিন বছর পর ভারত যাচ্ছি নানার বাড়ি বেড়াতে। বলা যায় চুরি করে। সঙ্গত কারণেই বর্ডার পার হতে একটু বেগ পেতে হলো। প্রায় দুপুর।

যাই হোক। বাসে উঠে রওনা হলাম। কিছুদূর যাবার পর সামনে ইছামতি নদী। নদী পার হয়ে আবার বাসে উঠতে হবে। তাই নদী পার হবার জন্য নদীর ঘাটে গেলাম। সেখানে কোনো কারণে ফেরি পারাপার বন্ধ ছিল। এ জন্য খুব ভিড় ছিল। সবাই নৌকায় করে নদী পার হচ্ছিল। আমরাও ঠিক করলাম নৌকাতে নদী পার হবো। কোনো নৌকাতেই বিশজনের বেশি নেয়া হবে না। প্রথম নৌকাটিতে আমরা উঠতে পারলাম না। পরের নৌকায় উঠলাম। যথাসময়ে নৌকা ছাড়লো।

তখন ভরা দুপুর। নদীর স্রোতধারা দেখতে খুব ভালো লাগছে। প্রচণ্ড ঢেউ এসে নৌকার বুকে বার বার আঘাত করে নৌকাগুলোকে ব্যস্ত করে রেখেছে। নদীর মাঝখানে ছোট ছোট নৌকাগুলো মনে হচ্ছে সিল মাছ উবু-ডুবু খাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন রঙের পাল তোলা নৌকা দেখা যাচ্ছে যা নদীর বুকে রঙিন ছায়া ফেলে হেলে-দুলে এগিয়ে চলেছে নিজ গন্তব্যে। নদীর অপর পাড়ে অনেক দূরে ইটের ভাটার ধোয়া দেখা যাচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে কি যে এক অপরূপ দৃশ্য তা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। মোহিত হয়ে দুই চোখ মেলে শুধু গোগ্রাসে গিলছিলাম আর নৌকা এগিয়ে চলছিল। যদিও আব্বা-আম্মা সঙ্গে ছিলেন তবুও একটু একটু ভয় লাগছিল। কারণ সবেমাত্র সাতার শিখেছি। অথচ নদীতে কি প্রচণ্ড স্রোত। তারপরও হঠাৎ করে মন থেকে ভয় হারিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে অবিষ্কার করছি কখনো নদীর এপারের কোলাহল মুখর ব্যস্ত জনপদে। আবার কখনো অপর পাড়ে শান্ত, শীতল রাখাল বালকের শিহরণ জাগানো বাশির সুরে।

নদীর বুকে হালকা মৃদু বাতাস নেচে-গেয়ে শরীরে ঘামহীন করলেও মাথার ওপরে প্রচণ্ড রোদের বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। কাছে একটা ছাতা ছিল। সেটি মেলে মাথায় ধরলাম। এই প্রচণ্ড রোদে

মাথার মগজ গলে ইছামতির পানিতে ভেসে যাবার ভয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক ঝটকা ঝড়ো বাতাস এসে আমার ছাতায় চেপে বসলো। তারপর সুতা ছেড়া ঘুড়ির মতো ছাতাটিকে উড়িয়ে নিল সোজা ইছামতির অশান্ত বুকে। আমি তো অবাক! শুধু তাকিয়ে দেখছি ছাতাটি নদীর বুকে উল্টো হয়ে পড়ে নৌকার মতো ভেসে চলেছে অন্য নৌকাগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

যখন আমার হুশ ফিরে এলো তখন শুনলাম, আমার আম্মা বলছেন, চলে গেল তো, তাড়াতাড়ি ধর। ততোক্ষণে ছাতা আমার নাগালের বেশ বাইরে। বুঝলাম নৌকার অন্যেরা সকলেই ঘটনাটিতে বেশ মজা পেয়েছে। তারা সকলেই ছাতাটির ভেসে চলে যাওয়া খুব আগ্রহ ভরে দেখছেন। আমাদের বেশ কিছুটা পেছনে একটি ছোট নৌকা ছিল। সেই নৌকার লোকগুলোও এই ঘটনাটি দেখেছিল এবং তারা দেখলো ছাতা ভাসতে ভাসতে তাদের নৌকার দিকেই যাচ্ছে। আমি ওনাদের ছাতাটি ধরার জন্য ইশারা করলাম এবং বুঝলাম, না বললেও তারাই ছাতাটিকে ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে দেখলাম ছাতাটি এক দিকে বাকা হয়ে পড়ায় ছাতার মধ্যে একটু একটু পানি উঠতে শুরু করেছে। এর মধ্যে ছোট নৌকাটি ছাতার খুব কাছাকাছি চলে এলো। এবং তখনই সবাইকে অবাক করে কিভাবে যেন ছাতাটি ডুবে গেল।

ছোট নৌকার লোকগুলো চেষ্টা করেও আমার ছাতাটি উদ্ধার করতে পারলো না। আমার মনটি খারাপ হয়ে গেল। এরপরে পৌছে গেলাম গন্তব্যে। শুধু পৌছালো না আমার ছাতাটি।

রাজশাহী থেকে

সুরক্ষিত

– ইকবাল শরীফ

নতুন চাকরি। পোস্টিং দক্ষিণ অঞ্চলের এক উপজেলা শহরে। নতুন জায়গা এবং নতুন পরিবেশে গিয়ে বেশ খারাপ লাগছিল। সেই উপজেলায় ইউনিভার্সিটির হলের এক বন্ধুর বাড়ি। ভাবলাম একবার ঘুরে এলে খারাপ হয় না।

একদিন বন্ধুর বাড়ি রওনা হলাম। ঠিকানা অনুযায়ী একটি রিকশা ভাড়া করলাম। কিন্তু কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর রিকশাচালক যেতে অসম্মতি জানালো। রাস্তা এতো খারাপ ছিল যে, রিকশায় আর যাওয়ারই উপায় ছিল না।

রিকশাচালক জানালো, গত বন্যায় রাস্তার এই বেহাল অবস্থা হয়েছে।

বর্ষাকালে এসব গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র বাহন নৌকা। রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাটা শুরু করলাম। বাংলাদেশের আর দশটা গ্রামের মতোই সেই গ্রামটি। আকা-বাকা পথ, দুইপাশে বিশাল শস্যক্ষেত। কৃষকরা ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। কাছাকাছি কোনো বাড়ি নেই। রাস্তার ধারে দুই একটা গাছ। মাঝে মাঝে কয়েকটি গরু-ছাগল এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছিল।

যখন রিকশায় আসছিলাম তখনো সূর্য বেশ প্রখর ছিল। মনে হয়নি কিছুক্ষণ পরেই এ নীল আকাশ মেঘে ছেয়ে যাবে। মেঘের আড়ালে চলে গেল সূর্য। শুরু হলো ঝির ঝির বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য সামনে দৌড় দিলাম। খুব কাছে কোনো আশ্রয়স্থল খুজে পেলাম না। কিছুদূর দৌড়ানোর পর দেখলাম সামনে কেউ একজন ছাতা মাথায় হেটে চলছে। তার কাছে গিয়ে কেন জানি থেমে গেলাম।

আড়ালেই দুজনের চোখে চোখ পড়লো। পরনে আকাশি রঙের শাড়ি, কপালে লাল রঙের টিপ ও ঠোটে লিপস্টিকের হালকা স্পর্শ। আকর্ষণীয় দেহের গড়ন। চোখের চাহনিতে আলাদা মাদকতা। মেদহীন ভারসাম্য দেহ ঝরনার ছন্দে যেন এগিয়ে চলছে।
ভদ্রমহিলার আড়চোখে তাকানো আমার বয়সের একজন ছেলের জন্য সত্যিই আকর্ষণীয় বটে। আমার এই ক্ষণিক ভালোলাগা বিসর্জন দিয়ে আবার সামনে দৌড় দিলাম। পেছনে শুনতে পেলাম, এই যে শুনুন।
থেমে গেলাম।
যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার ছাতার নিচে আসতে পারেন।
বিনয়ের সঙ্গে না বললাম।
তার দ্বিতীয় আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলাম না। তাছাড়া বন্ধুর বাড়ি এই প্রথম যাচ্ছি, বৃষ্টিতে ভিজে গেলে কেমন হয়। ঝির ঝিরি বৃষ্টি ও তার সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। দুষ্টু বাতাস তার শাড়ির আচল নিয়ে খেলা করছে। সামনের কয়েকটি চুল বার বার তার মুখে লুটিয়ে পড়ছে। ভদ্রমহিলা চুল ও আচল ঠিক করতে সদা ব্যস্ত।
তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার এই গ্রামে আসার কারণ বললাম। তিনি আমার বন্ধু আবীরকে চেনেন। তিনি আবীরের বাড়ি পৌছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি ইতিমধ্যে মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন। কয়েক মাস হলো পাশের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পদে যোগ দিয়েছেন। নাম কাকলি। তার বাড়ি আবীবের গ্রামেই।
বৃষ্টি বেশ কমে এসেছে। কথা বলতে বলতেই আবীরের বাড়ি পৌছালাম। মনে হতে লাগলো, এই পথ কেন হলো না বহুদূর। কথা থেকে গেল অসম্পূর্ণ। জানা হলো না অজানা কথা। তিনি বন্ধুর মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বিদায় নিলেন। বিদায় বেলা একটা হাসির ঢেউ হৃদয়ে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।
আবীব বাইরে গিয়েছে, ফিরতে বিকেল হবে। আমি কাপড় পাল্টিয়ে খাবার পর্ব সারলাম। বিছানায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছিলাম। পত্রিকার পাতায় যেন কাকলির মুখচ্ছবি ভেসে আসছিল। কাকলিকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।
বিকেলে আবীব ঘুম থেকে ডেকে ওঠালো। বহুদিন পর আবীবের সঙ্গে দেখা। তার এলাকায় পোস্টিং জেনে সে অত্যন্ত খুশি। আজ রাত তার বাসায় কাটানোর সম্মতি আদায় করে নিল। একদম শেষ বিকেলে গ্রাম ঘুরে দেখার জন্য বের হলাম। পুবের আকাশে রংধনু উঠেছে। একটু দূরেই দেখলাম কাকলি লক্ষ্যহীনভাবে হাটাহাটি করছে। চিনতে একটুও কষ্ট হলো না। কাকলির কথা বললাম আবীরকে।
কাকলিকে আমাদের কাছে সে ডাকলো। কাকলিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পরিচয় পর্বে কাকলি দুষ্টুমি হাসি আড়াল করার চেষ্টা করছিল। আবীরের প্রতিবেশী কাকলি এবং দূরসম্পর্কের কাজিন। সামনের এই গাছ দিয়ে সাজানো রাস্তার ধারে বড় বাড়িটা তাদের। কাকলি তার বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করলো। কথা দিলাম ঘুরে এসে যাবো।
কাকলির বাড়ি থেকে এসে দেখি আবীরের মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। খাবারের পর সারা রাত দুই বন্ধু গল্প করলাম। রাত ফুরায় যেন গল্প ফুরায় না। পরের দিন অফিসের তাগাদায় বের

হলাম, সঙ্গে আবীরও। কাকলির বাড়িতে গিয়ে জানলাম সে স্কুলে গিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা হলো না। কেমন জানি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু আবীরকে বুঝতে দিলাম না।
কয়েকদিন পর কাকলি আমার অফিসে হাজির। তারপর আমিও মাঝে মাঝে আবীরের বাড়ি আসি। দেখা হয়, কথা হয়, ভালোলেগে যায়, বলা হয় না ভালোবাসি। শুধু অপবাদ শুনতে হয় ভীরু বলে।
একদিন প্রচণ্ড সাহসী হয়ে অপরাধী সৈনিকের মতো মহারানীর কাছে আমার ভালোবাসার আর্জি পেশ করি। মহারানী অতিশয় আবেগ তাড়িত হয়ে আমার ভালোবাসার আর্জি মঞ্জুর করেন। ভালোবাসার সমুদ্রে অবগাহন করি দুজন কিছুক্ষণ।
আজ সেই কাকলি আমার ঘরনী। সে আজ আমার দুই সন্তানের জননী। আর সেই ভালোবাসার ছাতা যেন আজো আমাদের ভালোবাসাকে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

ঢাকা থেকে

ছাতার বাট

– সীমানা আহমেদ

মানুষের জীবন বড়ই বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্রময় জীবনে চোখের পলকে কখন কি ঘটে যায় তা বলা বাহুল্য, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে। কারণ কথায় আছে মেয়েদের ভাগ্য নাকি দেবতারও অজানা।
মানুষ তার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা হৃদয়ের অন্দরমহলে অত্যন্ত যত্ন করে গচ্ছিত রাখে আর কিছু কিছু স্মৃতি শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না, ভোলা যায় না। এই স্মৃতিকে স্মরণ করতে গিয়ে কেউবা হয় আনন্দে আপ্লুত আবার কারো চোখে অজান্তেই পানি এসে যায়। এমনি আমার জীবনের একটি লোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী।
সেদিন ছিল আষাঢ়ের শেষ দিন। গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে আমার বান্ধবী স্নিগ্ধার বাসায় তার ছোটবোনের জন্মদিনের নিমন্ত্রণে। অনুষ্ঠান শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন বাইরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অগত্যা তাদের বাসা থেকে একটি ছাতা নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিতে হলো। যেহেতু সন্ধ্যা বেলায় আমি একা সেহেতু এক অজানা আশঙ্কায় মন দুরু দুরু করে কাপছিল। কিছুদূর আসার পর হঠাৎ মামুন তার তিনজন সহযোগীসহ আমার পথ আগলে দাড়ায়। আমাকে অনেক দিন থেকেই সে বিরক্ত করে আসছিল এবং একদিন কুপ্রস্তাব দেয়ায় মামুনের গালে কষে একটি চড় মেরেছিলাম। তখন মামুন আমাকে বলেছিল, তোকে একদিন দেখে নেবো।
এদেরকে দেখে আমার গলা শুকিয়ে যায়। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে রাস্তায় লোকজনের চিহ্নমাত্র ছিল না। আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই গামছা দিয়ে মুখ বেধে পাজাকোলা করে পাশের ঝোপে নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা আমার পরনের কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলে আমার উন্মুক্ত বুক নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে। এরপর তারা পালাক্রমে আমাকে নিয়ে ধর্ষণে মেতে ওঠে। তারা শুধু তাদের পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, এমনকি যাওয়ার আগে আমারই ছাতার বাটটি যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিতেও তারা এতোটুকু কুণ্ঠা বোধ করেনি।
আমার জীবনের এই দুর্বিষহ ঘটনা কাউকে বলিনি সমাজে কলঙ্কিনী হিসেবে পরিচিত হওয়ার ভয়ে। কিন্তু সেই স্মৃতি আমাকে আজো তাড়িয়ে বেড়ায়। তাড়িয়ে বেড়াবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

উত্তর বাংলা থেকে